বাংলা দেহতত্ত্বের গান

সংকলন প্রসঙ্গে

যে কোন দেশের বহুকালের প্রবহমান জীবন ও সংস্কৃতির ধারাকে সঠিকভাবে বুঝে নেবার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সহজ পথ হ'লো সেই দেশের চিরায়ত গানের সংকলন প্রস্তুত করা এবং সতর্ক বিশ্লেষণে ও বিন্যাসে তার উপস্থাপন। দেহতত্ত্বকে ঘিরে বাংলা গান চর্যাপদের সময় থেকেই উৎসারিত। কিন্তু মধ্যযুগের পর থেকে সহজযান বৌদ্ধমত, তান্ত্রিক যোগাচার, প্রতিবাদী ইসলামী চেতনা, সুফীবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের ভাবধারা মিলেমিশে একধরণের বিশেষ গানের চলমানতা দেখা যায়। তাদের সাধারণভাবে 'বাউল গান' ব'লে চিহ্নিত করলে খানিকটা প্রান্তবাদী হ'তে হয়। কেন না বাউল একটি মতবাদ বা জীবনাদর্শের ছক। তাদের সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক বাংলা গৌণ ধর্মগুলির মিল আছে কিছু কিছু, অমিলও কম নেই। মোট কথা বাংলার দেহতত্ত্বের গান মানেই বাউল গান নয়, তবে বাংলা দেহতত্ত্বের গানের একটি সমৃদ্ধ অংশে বাউল গানের সমুজ্জ্বল উপস্থিতি খুব গৌরবের।

বহুবছরের প্রযত্নে বিশেষ পরিকল্পনায় বর্তমান গীতি-সংকলনটি গ'ড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রাপ্তব্য ও দুষ্প্রাপ্য বহুরকমের সংকলন ঘেঁটে এই গীতি-মঞ্জুষার আধারটি পূর্ণ হয়েছে দুইশত গানে। পাঠক ও সংগ্রাহকদের অনুকম্পা ও উৎসাহ লাভ করলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কেননা বইয়ের দাম ও ব্যবহারযোগ্যতার কথা ভেবে সংকলনটি আপাতত সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণাঙ্গ করার ইচ্ছা দমন করতে হয়েছে। তবে সব দিক ভেবে বলা যায়, বাংলা দেহতত্ত্বের গানের এটি এক নির্ভরযোগ্য, প্রতিনিধিত্ব-মূলক ও পরিচায়ক সংকলন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিন্যস্ত প্রথম সংকলনও বলা যায়। কেননা এখানে লালন শাহ্-র মত প্রধান গীতিকারকে যেমন গ্রহণ করা হয়েছে তেমনই গুরুত্বে গৃহীত হয়েছেন লালশশী ও ফিকিরচাঁদ, দীন শরৎ ও জালা-লুদ্দিন, হাসন রাজা ও কুবির গোঁসাই। পদের সংখ্যা বিচারে লালনকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্যদের গানের সংখ্যা যথাযথ বিবেচনাতেই গৃহীত হয়েছে। কারুর

কারুর হয়ত একটি বা দুটি গান আছে, তাতে তাঁদের গুরুত্ব হীনতা সুচিত হয় না। বাউলগান বাদেও এ সংকলনে আছে মারফতী-মুর্শিদা-ফকিরি গান, ফিকিরচাঁদী গান, সহজিয়া বৈষ্ণবীয় গান, কর্তাভজা-সাহেবধনী-বলরামীদের গান, ধুয়ো গান, মহিলা রচিত গান এবং অনামিকা পদ। দুটি আক্ষেপ অবশ্য থেকে গেল। গানগুলিকে কালানুক্রমে সাজানো গেল না কেননা এ-জাতীয় গানের কাল-নির্ধারণ নিঃসংশয় নয়, যেহেতু সব গীতিকারের জীবনতথ্য তথা জন্মসাল অলভ্য। আক্ষেপের দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে,সব রচয়িতার জীবন-পরিচয় পাওয়া যায়নি ব'লে গীতিকার-পরিচিতি দেওয়া গেল না।

গত বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ আমার ধারাবাহিক গ্রাম পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় এবং গৌণ ধর্মগুলির উৎস অনুসন্ধানের কাজে নানাভাবে গান সংগ্রহ করেছি। তখন বারে বারে মনে হয়েছে, জিজ্ঞাসু ও নিরীক্ষাপ্রবণ আধুনিক বাঙালী পাঠকদের ব্যবহার্য বাংলা লোকায়ত গানের একটি শোভন ও সর্বাত্মক সংকলন থাকা উচিত। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রণীত এই বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হ'লেন তরুণ প্রকাশক শ্রীমান অরূপ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈবাল সরকার। তাঁদের সদিচ্ছাকে বলিহারি দিই। বইটি পরিবেশনার দায়িত্ব আর প্রকাশনার সানুপুঙ্খ চাহিদা পূরণ করেছেন 'পুস্তক বিপণি'র স্নেহভাজন শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার। অলংকরণ ও প্রচ্ছদ অঙ্কনে স্নেহভাজন শ্রীসুশোভন অধিকারীর ভূমিকা অভি-নন্দনীয়। একইরকম প্রযত্ন নিয়েছেন প্রেসকপি প্রস্তুতির কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ দে।

গান সংকলনের কাজে ও বহু পরামর্শে উপকৃত করেছেন খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী এবং অধ্যাপক-বন্ধু নিখিলকুমার নন্দী। গানের দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অর্থ-সংকেতে সাহায্য করেছেন নদীয়া জেলার গোরভাঙ্গানিবাসী মহবুব হোসেন খাঁ। একটি দুর্লভ বই দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র। অন্যান্য নানাধরণের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন শ্রীচন্দ্রমোহন দাস, শ্রীসুধীর সিংহরায়, শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসুবোধ দাস, শ্রীঅম্বিকা দে ও শ্রীকুন্তল মিত্র। ধন্যবাদ প্রেস কর্মীদেরও প্রাপ্য।

বাংলা দেহতত্ত্বের গান : ভূমিকা

দেহতত্ত্বের গান ব'লে একরকম লোকায়ত বর্গের গান যে বাংলাদেশে বহুকাল ধ'রে চলে আসছে একথা সত্য। কিন্তু তার পরম্পরাগত নির্ভরযোগ্য কোন সংকলন যে গ'ড়ে ওঠেনি একথাও ঠিক। তার চেয়েও যেটা লক্ষণীয় তা হ'লো বহুদিনের বহুরকমের বাংলাগানের প্রবাহে মিলেমিশে-থাকা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে আলাদাভাবে শনাক্ত ক'রে তার স্বরূপ লক্ষণ ও বৈচিত্র্য নির্ণয় বা থিমেটিক বিশ্লেষণ হয়নি। তার ফলে দেহতত্ত্বের গানগুলি সম্পর্কে আমরা দুরকম ভুল ক'রে চলেছি। কেবল দেহসংক্রান্ত শব্দাবলী যেসব গানে আছে সেগুলিকেই একমাত্র দেহতত্ত্বের গান ব'লে চিহ্নিত করেছি এবং তার ফলে শিক্ষিত সমাজে এসব গান সম্পর্কে খানিকটা হীন ধারণা জন্মে গেছে। অথচ ভেবে দেখা হয়নি যে, দেহতত্ত্বের গান কেবল বাউলরাই লেখেননি, বস্তুত বাংলা গানের একেবারে আদি উৎস চর্যাগীতি থেকে শুরু ক'রে মধ্যযুগের সহজিয়া বৈষ্ণবদের গান, যোগীসম্প্রদায়ের গান এমনকি রামপ্রসাদের শাক্ত গানে দেহসাধনার কথা স্পষ্ট রয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে দেহসংকেত পাওয়া যায় বাউল ও মারফতী গানে, কর্তাভজাদের গানে, সাহেব ধনীদের গানে, বলরামীদের গানে ও ফকিরি গানে। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে জোর পড়েছে এই দ্বিতীয় ধরনের গানে। তার কারণ এইসব উপধর্ম সম্প্রদায় কেবল যে দেহাত্মবাদী তাই নয়, তারা কায়াসাধনাতেও বিশ্বাসী। কায়াসাধনার অঙ্গে কিংবা সেই সাধনার সঠিক পথ নির্দেশের জন্যই এসব গানের জন্ম। লক্ষণীয় যে উচ্চবর্গের ধর্মসম্প্রদায়ের মত তাঁরা শাস্ত্র বা মন্ত্র না লিখে গান লিখেছেন। গান কেন? রবীন্দ্রবাণী আশ্রয় ক'রে বলা যায় :

শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি

সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে
আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে ; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র ;
আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য
করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে
নিয়েই গান গাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মা বলতে যে-ভাবাত্মক অনুষঙ্গ গ'ড়ে তোলেন লোকধর্মে অবশ্য তার অবস্থান দেহকেই ঘিরে। বাঙালী লোকগীতিকার আত্মার নিরঞ্জন মূর্তি ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করেন,

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
আত্মা কোন অলৌকিক কিছু নয়।
বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে আত্মার বিকাশ হয়ে
জীবন রূপ সে পেয়ে জীবেতে রয়।

এখানে গীতিকার 'বস্তু' কথাটিকে স্পষ্ট করেননি, কেবল বলেছেন 'বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে আত্মার বিকাশ'। আরেকটি গানে এই বস্তু কথাটা স্পষ্ট হয়, যখন গানে বলা হয়,

যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন।

এখানে জীবনের কারণ ব'লে যে-বস্তুকে সংকেত করা হচ্ছে তা হ'লো শুক্ররস। সেই শুক্ররসের জন্ম বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে। এই বস্তু সমন্বয় ব্যাপারটি বুঝে নেওয়া দরকার।

লৌকিক এইসব দেহাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন এমনতর ভাবনার ক্রমে যে, দেহের সবচেয়ে উপরিভাগে আছে চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, মাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা আর সেই মজ্জার মধ্যে শুক্র। শুক্রের মধ্যেই আছে প্রাণের বীজ। এই পর্যন্ত দেহের যে বস্তুগত ক্রম দেখা গেল তার পরের ক্রমপর্ব কিছুটা ভাবাত্মক। সেই ক্রমটা এই রকম যে,—শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণবীজ, সেই প্রাণের মধ্যে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে

প্রেম, প্রেমের মধ্যে আছে সহজ বা আলেক'সাই। তারই আরেক নাম মনুয়ায় বা মনের মানুষ। সুতরাং প্রেমই এইসব সাধক ও কবিদের প্রধান অন্বিষ্ট। কিন্তু সেই অন্বেষণের পথ জটিল ও কঠিন। কেননা প্রেমের পথ পদে পদে কামে আচ্ছন্ন। সেই কাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রেমের উপাসনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা দেহের সম্মোহ, অথচ দেহকেই পেরিয়ে (এড়িয়ে নয়) অন্বিষ্টকে পেতে হবে। তারজন্য চাই গুরুর উপদেশ-নির্দেশ, দম বা শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, দেহকে ঘিরে দেহকেই অতিক্রম করবার অর্জিত সূক্ষ্ম কৌশল। এ সব কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য চাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে, নারী সম্পর্কে, তাদের দেহবিজ্ঞান সম্পর্কে, প্রজনন তত্ত্ব সম্পর্কে। কারণ

পিতা শুধু বীর্যদাতা
পালন ধারণ কর্ত্রী মাতা।

এখানে গুরুত্ব এসে যাচ্ছে মাতৃকাশক্তির উপর। লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাতৃকাশক্তি বা নারীর প্রতি মনোযোগ দেহাত্ম-বাদীদের একটা সাধারণ লক্ষণ। কেননা সঠিক সাধনা ও কায়াযোগে নারী যেমন সাধককে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে তেমনই নারী সম্মোহে এসে যেতে পারে ক্রম-পতনের রৌরব। দেহবাদীদের কাছে নারী তাই এক সমাধানহীন দ্বৈতের মত। তা একই সঙ্গে ধারক ও বৈনাশিক। উর্বরা অথবা বন্ধ্যা।

এই সূত্রেই বাংলা দেহতত্ত্বের গানে অতি সহজে এসে যায় ক্ষেত্র আর বীজের রূপক। বাংলার আদি গান চর্যাপদে কায়ারূপ-গাছে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ-ডালের কথা আছে, রামপ্রসাদ লিখেছেন মানব-জমিনের অনাবাদী পরিণামের ইঙ্গিত। এ সবই ঠারেঠোরে ক্ষেত্র ও বীজের ইঙ্গিত আনে। যোগীদের গানে হয়ত সেই ইঙ্গিত-ধর্মিতা খানিকটা স্পষ্টতা পায় যখন শুনি,

মায়ের চারচিজের কথা শুন মন দিয়া
গোস পোস লোহ খোস চারচিজে হুনিয়া।

বাপের চারচিজের কথা শুন দিয়া মন
হাড় রগ মণি মগজ চারচিজে পত্তন।

এখানে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, মানবশরীরে আছে মায়ের চারটি উপাদান (মাংস, ত্বক, রক্ত, কেশ) আর বাবার চারটি উপাদান (হাড়, শিরা, শুক্র, মগজ)। কিন্তু এরপরে যোগীর গান ইঙ্গিত করে অন্য এক দিকে। বলা হয়,

আর এক চিজের কথা কইতে বাসি লাভ
ভাঙ্গিলে মধুর ভাণ্ড পানি রবে কাত।

লজ্জাবশত অনুক্ত সেই চিজটি হ'লো স্ত্রীরজ, যা সবকিছুর ধারক ও সম্মোহক। পুরুষের বীজকে স্ত্রীরজের সান্নিধ্যে আনাই সবচেয়ে নিগূঢ় জৈবনিক লক্ষ্য। কেননা তারফলেই জীবনের উদ্‌ভব, মানবজীবন, যা সকল জীবনের সেরা। সেই মানবজীবন গ্রহণ করা, সেই মানবজীবনের সাধনা, মানুষের করণ, দেহাত্মবাদীদের সবচেয়ে বড় ক্রিয়াপরতার লক্ষণ। দেহাত্মবাদী গীতিকারের দৃপ্ত ঘোষণা হ'লো,

কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন—
ধ্যানধারণা ভজনপূজন মানুষ সর্ব ঠাঁই।

এর পরবর্তী সম্প্রসারণে অনায়াসে উচ্চারিত হবে এতবড় কথা যে,

মানুষের আকার ধ'রে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে।

তাই যদি সত্য তবে শাস্ত্র, মন্ত্র, দেবতামূর্তি গঠন, পূজাবিধি, ধর্মাচার, মন্দির-মসজিদ, পূজারী ব্রাহ্মণ বা আলেম, দীপ ধূপ ধুনা শঙ্খ ঘণ্টা সবই অসত্য, অপ্রয়োজনীয় ব'লে পরিত্যাজ্য। তার অনেকটাই ফাঁকিজুকি, লোকদেখানো, বা ধর্মান্ধতা। পূজার ছলে উপাস্যকেই ভুলে থাকা।

এই জায়গাতেই সনাতন উচ্চবর্গের ধর্মমতের সঙ্গে নিম্নবর্গের ধর্মধারণার বিরোধ এবং সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অবশ্য নিরুচ্চার নয় বরং গানে-গানে তীব্রতায় গাঁথা। এমন কয়েকটি প্রতিবাদী গানের অংশ লক্ষ করা যাক।

১. ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে।
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপতপ এত করে জলে স্থলে?
২. যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতেই মিশায়
তবে ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে?

প্রথম উদাহরণে ব্যবহারিক জপতপের বিরোধিতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বর্গ-নরক ধারণার ভ্রান্তি ও স্ববিরোধ ঘোষণা। শুধু উচ্চবর্গের সঙ্গে লড়াই নয়, দেহাত্মবাদীরা নিম্নবর্গের ভ্রান্তমতি সেই সব মানুষকেও সঠিক পথ-নির্দেশের জন্য গান লেখেন যাঁরা ধর্মের নামে নানা ভণ্ডামি আর অপদেবতা পূজায় জড়িয়ে পড়েছেন। বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলা হয়েছে,

১. হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে মাটির ঢিবি কাঠের ছবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?
২. জিন-ফেরেস্তার খেলা পেঁচোপেঁচি আলাভোলা—
ফেঁও-ফেঁপি ফ্যাক্‌সা যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা।

এসব পদে হরিষষ্ঠী, মনসা, মাখাল ও পেঁচোপেঁচি লৌকিক কুসংস্কারজাত নানা অপদেবতার নাম। যারা নিম্নস্তরের চেতনা-সম্পন্ন (ফেঁও-ফেঁপি) সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এবং অন্তঃসারহীন (ফ্যাক্‌সা) তারাই জিন-ফেরেস্তা বা আলেয়ার আলো (আলাভোলা) বা মিথ্যাকথার প্রতারণায় (ভাকা-ভুকো) ভোলে, সেই ফাঁদে পা দেয়। তাদেরও উদ্ধার ক'রে মানুষতত্ত্বে পুনর্বাসন করা দরকার। কাজেই দেখা যাচ্ছে, উচ্চবর্গের মানুষের ধর্মসাধনের যা মূল লক্ষ্য অর্থাৎ আত্মমুক্তি আর স্বর্গপ্রাপ্তি, লোকায়ত দেহবাদী সাধক কবিরা তার চেয়েও বড় লক্ষ্যের দিকে উৎসুক। তাঁরা চান ধর্মের নামে অসত্যের উৎসাদন, সামূহিক চেতনার জাগরণ এবং মানবসত্যের সঠিক পথে সকলকে টেনে আনতে। তাঁদের সামগ্রিক সমাজ চেতনা

জায়মান জীবনের প্রতি আসক্তি বিশেষ ঈর্ষণীয়। বৈরাগ্যের পথ, তীর্থ-উপবাস ব্রত-পালনের কৃত্য তাঁদের জন্য নয়।

এই যে এক ব্যাপক সামাজিক বোধ, তার শিকড় খুঁজে পেতে গেলে আমাদের লৌকিক গানের একেবারে অতলে ডুব দিতে হবে। কোন বিচ্ছিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় এমনতর গান রচনা হ'তে পারে না। দেহতত্ত্বের গানে কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজের এমন সব রূপক আর প্রতীক গাঁথা আছে যে তার বোধগম্যতা আর চলাচলের জন্য এক সংহত গ্রাম্যসমাজ দরকার। পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা এ-জাতীয় গ্রাম্য সমাজ সংহতিকে কেউ বলেছেন 'জৈবিক সমাজ' কেউ বলেছেন 'কমিউনিটি'। এ-জাতীয় সমাজে নানা বৃত্তির মানুষ লেনদেন ক'রে বেঁচে বর্তে থাকে। যে লাঙলের ফাল আর কাস্তে বানায় তার সঙ্গে গরুর গাড়ি বানানোর ছুতোরের যোগ থাকে। নৌকো যে গড়ে আর সেই নৌকো চ'ড়ে যে মাছ ধরে তাদের মধ্যে অন্যোন্য সম্পর্ক থাকতেই হয়। আবার এদের সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাষীকে জমি হাসিল ক'রে বীজ বুনে শস্য তৈরি করতে হয়। গ্রাম্য জোলা তাঁত চালিয়ে বস্ত্র আর গামছা বোনে, তবে হয় লজ্জা নিবারণ। তেমনই মোদক সম্প্রদায় বানায় চিনি, শিউলিরা গাছ কেটে রস থেকে গুড় করে। জৈবিক সমাজে এইসব বিচিত্র বৃত্তি-জীবী মানুষ গায়ে গায়ে লেগে থাকে। তাঁদের সমন্বিত জীবনের লেনদেনের শরিক হয়ে থাকে বাউল ফকির বা দেহাত্মবাদী সাধকরা। তাঁদের গানের ভুবনে অতি সহজে তাই প্রবাহিত বস্তুজীবনের ছবি রূপকে-প্রতীকে উঠে আসে। তা শহরবাসীর কাছে অজ্ঞাত বা দুর্বোধ্য হ'লেও গ্রামবাসীর কাছে খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ লাগে। গীতিকারদের লক্ষ্যও কিন্তু তাঁরাই। যেমন জীবনের অনিত্যতা, দেহের নশ্বরতা আর প্রাণের আসা-যাওয়া বোঝাতে গ্রাম্য গীতিকার লেখেন, খাঁচার ভিতর অচিন পাখির উপমা। রূপকপ্রিয় গ্রাম্য শ্রোতাকে দেহ-খাঁচার বিষয়ে আসক্তি ত্যাগের উপদেশ দেবার জন্য এবারে গানে বলা হয়,

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে।

সাধন বিষয়ে মানুষ কেমন অসহায় ও পরনির্ভর (গুরু বা শাস্ত্র বা মন্ত্র) তা বোঝানো হয় এক পংক্তির বিন্যাসে—

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।

ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিত্ব এরপর আঁকে এক মেটাফিজিকাল চিত্রকল্প, ভাবাত্মক দ্যোতনায়—

শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে।

গ্রাম্য মানুষই কেবল বুঝবেন এই পার্থক্য—ঘর আর কুঁড়ে-ঘরের। প্রথমটি বহুমানুষের কলকোলাহলে মুখরিত ভজন কীর্তন দ্বিতীয়টি নিঃসঙ্গ নির্জন সাধকের প্রতীক রূপে এসেছে। এইভাবে বাংলা দেহতত্ত্বের গানে এক সমৃদ্ধ অতীত সমাজের পরম্পরার স্মৃতি জেগে আছে।

অবাক লাগে ভাবলে যে, নানাভাবে দেখা, বহুভাবে জানা ব্যবহারিক গ্রামিক জীবনের কত রকম চিত্র ও পরিবেশ দেহতত্ত্বের গানে রূপক বা উৎপ্রেক্ষার ভঙ্গীতে রয়ে গেছে। সতর্ক পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়ে। একটি গানে নিজের ভজন সাধনহীন ব্যর্থ জীবনের উপমা গীতিকার দিয়েছেন 'জন্ম-ছাদা নৌকা'-র সঙ্গে। নৌকায় দক্ষ মাঝি বলতে বোঝানো হয়েছে গুরুকে। নিজের দেহকে বলা হয়েছে কুঁড়েঘর, যাতে হাড়ের গাঁথুনী আর চামের ছাউনি। তার 'গড়নদার' বা 'ঘরামী' বলা হয়েছে ঈশ্বরকে। সাধক নিজের দেহকে বলেছেন দেহ-তরী আর নির্মাতা 'সুত্তুরধর' হলেন স্বয়ং বিধাতাপুরুষ। উপমা পালটে দেহ-তরী হয়েছে দেহ-নদী। তখন খেদোক্তি এমনতর,

যখন নদী বোঝাই ছিল
ঝড় তুফানের ভয় ছিল না গো—
নদীর জল শুকাইল চর পড়িল
তবু নদীর বেগ গেল না।
আমার এই দেহ-নদী ॥

এক্ষেত্রে নদীর বেগ বলতে কামনা বোঝানো হচ্ছে। অন্য আরেক গানে নদীর উপমা ভিন্নতর অনুষঙ্গ বয়ে আনে। সেখানে স্ত্রী জননাঙ্গের উপমা হয় বাঁকা নদী। সাধক কবি সাবধান ক'রে বলছেন,

নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে
বিষ্ঠেবুদ্ধি রয় না ঘটে
কাম নামে কুমির জুটে
চিবিয়ে চুষে খায় তাকে।

এমন স্বাভাবিক বস্তুবাদী গ্রামিক কল্পনা খেত-ফসল-বীজ-সারের উপমায় দেহতত্ত্বের মূল কথা বোঝাতে চায়। একই টানে নদীর জোয়ার-ভাঁটা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, নদীস্রোতে ভেসে-আসা মীন, স্রোতে-ভাসা দীপ এইসব রূপক আর বর্ণনা এসে যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজে জমিতে শস্য উৎপাদন আর নারীর গর্ভে সন্তান আগমন একই যাতুবিশ্বাসে গৃহীত হয়। দুটিতেই খেত আর বীজের সমভূমিকা। মাতৃবস্তু আর পিতৃবস্তুর সমন্বয়। তবু বিশেষ ভাবে মাতৃকাশক্তির প্রাধান্য দেহতত্ত্বের গানে আলাদাভাবে বোঝা যায়। এই প্রাধান্যের কারণ সম্ভবত এই যে কৃষিকাজের আবিষ্কার আদিম সমাজে বিশেষত নারীরই আবিষ্কার। সন্তান ধারণ, সন্তানজন্ম আর সন্তান পালনের ক্ষেত্রেও নারীর অগ্রাধিকার। তাছাড়া কোন কোন গ্রাম্য সমাজে পতিত জমিকে উর্বরা করবার জন্য স্ত্রীরজ ব্যবহারের কথা শোনা যায়। সুস্থ স্বাভাবিক যৌন জীবনের সঙ্গে জমির ফলনের একটা যোগ সেই সমাজে বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত।

বাংলা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে তাই বিচ্ছিন্ন কোন গীতিকারের ব্যক্তিগত ভাবের স্ফুরণ বা নান্দনিক উৎসার হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এ গুলিতে স্তরান্বিত হ'য়ে আছে আমাদের আদি থেকে বহমান লৌকিক গ্রামিক সমাজের বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সত্য। যে গ্রাম্য নারীসমাজ আমাদের ব্রতকথাগুলির সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে দেহতত্ত্বের গানের একটা যোগ থাকা সম্ভব। দুয়েরই কাজ উর্বরতা

চেতনাকে জাগানো। কেউ কেউ মনে করেন প্রজনন রহস্য আদিম মানুষদের চেতনায় যে ভাবে ধরা পড়েছে তার একটি নজির নারীর উর্বরা শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির উর্বরা শক্তির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা। সন্তান উৎপাদন আর ফসল উৎপাদন একই ক্রিয়ার দুটি আলাদা পর্যায়। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেছেন : The belief that the sexual act assists the promotion of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensible to seeure it, is universal in the lower phases of culture।

কিন্তু কেবল প্রজনন নয়, প্রজননের নিরোধও দেহাত্মবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য। কায়াসাধনার মধ্যে দিয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌনতার নিয়ন্ত্রণ একটা সাধনা এবং সেই সাধনার লক্ষ্যে নারীই প্রকৃত সঙ্গী। কিন্তু এই লক্ষ্যে সফল হ'তে গেলে ধাপে ধাপে সাধনার তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয় গুরুর উপদেশে, তবে সাধকের দেহ পক্কতা লাভ করে। এ-সাধনার প্রথম ধাপ 'প্রবর্ত' অবস্থা, অর্থাৎ যখন শুধু নামাশ্রয়। এ অবস্থা অতিক্রম ক'রে প্রার্থী পৌঁছোন 'সাধক' স্তরে, তখন ঘটে মন্ত্রাশ্রয়। এর পরের ধাপের নাম 'সিদ্ধ' অবস্থা। এটাই সাধনার শেষ ধাপ, এ-সময় ঘটে রূপাশ্রয়, অর্থাৎ নারীসঙ্গিনীর সঙ্গে কায়াসাধনের বিধি। অনেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেন না। প্রবর্তক বা সাধক রূপেই হয়তো তাঁদের অবস্থান থেকে যায়। লালন ফকির, কুবির গোঁসাই, লালশশী, হাউড়ে গোঁসাই, পাঞ্জ শাহ, যাদুবিন্দু (যাদু এবং তাঁর সাধনসঙ্গিনী 'বিন্দু'-র নাম মিশিয়ে), দুদ্দু শাহ, আর্জান শাহ, জালালুদ্দিন প্রভৃতি অনেক গীতিকার সিদ্ধস্তর পর্যন্ত পৌঁছে তবে গান লিখেছেন। তাঁদের গানে তাই উচ্চভাবমূলকতা ছাড়াও কায়াসাধনার অনেক সংকেত আছে। চাষের প্রতীকে একটি গানে বলা হয়েছে,

আবাদ কর চৌদ্দপোয়া জমি লয়ে।
মন রে জোড়ো 'ধর্ম'-হাল 'প্রবর্তক'-ফাল
'সাধক'-মুড়ায় 'সিদ্ধ'-ঈষ লাগাইয়ে।

এখানে লাঙলের অনুপুঙ্খ প্রতীকে দেহ-জমি কর্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে গ্রামীণ কৃষিজীবী শ্রোতাছাড়া এ গানের হাল ফাল, মুড়া ও ঈষের রূপক অন্য কেউ বুঝবেন না।

এই বোধগম্যতার প্রশ্নে আমরা একটা বৃহত্তর প্রসঙ্গে পৌঁছে যাই। প্রসঙ্গটি এই যে, চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে শাক্তগান পর্যন্ত বাংলা গানের যে-আটশো বছরের ধারা-বাহিকতা তাতে রূপকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যরকম বেশি। রূপককে যদি একধরণের mataphor বলা যায় তবে গানে তার কার্যকরতা কি এ-প্রশ্ন ওঠে। গানকে কি সর্ব সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং বিশেষ সাধকের কাছে দ্যোতনা-বহুল করবার জন্য এই রূপক প্রয়োগ? চর্যাগানের ক্ষেত্রে যদি বা একথা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু সামগ্রিক বাংলা গানের প্রবাহে কথাটি টেঁকে না। কারণ প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রকাশের তো এক একটা ধরন থাকে, বাঙালীর গানে রূপক ব্যবহারের কৌশল, এমনকি অতিরেক তেমনই এক বিশেষ ধরন। রামপ্রসাদ যে অত সহজে মানব-জমিন বা কালীপদ-নীলাকাশ ভাবতে পেরেছিলেন কিংবা ভাটিয়ালি গানে 'মন-মাঝি তুই বৈঠা নে রে', ফিকিরচাঁদি গানে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'লো' এই পারাপারের রূপকল্প অনায়াসে গড়ে তুলেছিলেন তার কারণ বাঙালী শ্রোতা সহজেই রূপক বোঝেন। অর্থাৎ রূপকের মধ্যেকার অন্তঃসার সহজে ধরতে পারেন। এর কারণ বস্তুজগৎ আর ভাবজগৎকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা বাঙালীর নিজস্ব স্বভাব। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাঙালী গীতিকার বরাবরই প্রাকৃত জীবনের রূপক টেনে আনতে অভ্যস্ত। 'হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি'-র মত উৎকৃষ্ট গানের কথা বাদ দিলেও বস্তু থেকে ভাবে অনায়াস পরিক্রমার বহু উদাহরণ বাংলা গানে আছে। তার সবই কিছু গ্রাম্য গান নয়। বৈষ্ণব পদে যখন রাধার জবানীতে বলা হয়, 'আমার বুকের কাঁচুলী কৃষ্ণ করাঙ্গুলি / করের ভূষণ সেধা' তখন ভাবনার যে চমৎকারিত্ব ফোটে রূপকতার আশ্রয়ে তেমনই অন্বয় বোধের

চমকপ্রদ নমুনা ফোটে দেহতত্ত্বের গানে যখন পাই,

চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি।

গৌর আমার শঙ্খ শাড়ি

গৌর মালা পুঁইচে পলা চুল-বাঁধা দড়ি

দুই হাতের চুড়ি গৌর কাঁচুলি।

দেহতত্ত্বের বাইরেও বাংলা গানের রূপক প্রবণতা কত অমোঘ তা বোঝাতে আরেকটি গান দেখা যেতে পারে—

পূজিব পিরিতি প্রেম-প্রতিমা করি নির্মাণ—

অলংকার দিব তাহে আমার যত আছে অভিমান।

যৌবন সাজায়ে ডালি কলঙ্কে পূরি অঞ্জলি

বিচ্ছেদ তাহে দিব বলি দক্ষিণা করিব এ প্রাণ।

এ ধরনের রূপক ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে এক ধরনের দোলাচল লক্ষ করা যায়। মিডলটন যারে হয়ত এমন দোলাচল সম্পর্কেও বলতে পারতেন the spiritual has been brought down to the Physical—কিংবা উল্‌টোভাবে the Physical has been taken up to the spiritual। অবশ্য দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ থেকে যে-বাংলা আধুনিক গানের নবধারা উৎসৃষ্ট হয়েছে তার বাণীতে চিত্রকল্প থাকলেও রূপক খুবই কমে গেছে (একমাত্র ব্যতিক্রম অতুলপ্রসাদের গান)। তার একটা কারণ এই হ'তে পারে যে, আধুনিক নাগরিক মনন তেমনভাবে রূপক নির্মিতিতে সাড়া দেয় না। তবে আধুনিক পূর্ব বাংলা গানে রূপক ব্যবহার অবিরল। দেহতত্ত্বের গানে রূপকের আবরণে তত্ত্ব বা ভাবকে অর্ধস্ফুট রাখা একটা সচেতন কৌশল। যা আধোপ্রকাশ্য তার আকর্ষণ অমোঘ। কিন্তু সেই সঙ্গে দেহতত্ত্বের গানের যাঁরা রচয়িতা তাঁদের দেখা ও দেখানোর সামর্থ্যের কথাও বলা দরকার। নিরঞ্জন চোখে সুন্দর-অসুন্দরে মেশা এই জীবন তার সহস্রবিধ বিস্তারে ধরা পড়েছিল তাঁদের চেতনায়। সেখানে নীতি বা সাম্প্রদায়িকতার কোন অবিলতা জাগে নি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভেবেছেন,

গাছের পাতায় সূর্যের আলোয় ছোঁওয়া লাগে, অমনি

এক জাগ্রৎ শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্বন্ ছেঁকে নেয়, তেমনি মানবসমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চারদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধ'রে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়।

এইসঙ্গে আরেকটা দিকও আছে। তাঁদের সামনে ছড়িয়ে-থাকা জীবনকে স্বচ্ছ সহজ চোখে দেখবার সত্যসুন্দর দৃষ্টিও ছিল। তাই লৌকিক ভাবনার স্বাভাবিকতা থেকে তাঁরা দৈহিক সাধনাকে বলেন 'লতা সাধনা।' বস্তুত পুরুষ ও নারীর শরীরের মধ্যে অজস্র শিরা উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্র (গানের ভাষায়, 'ঢাকার বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি') যেন লতার মত সঞ্চারিত এবং নানাসূত্রে মূলের সঙ্গে গূঢ় ভাবে সংযুক্ত। বিশেষত নারীর জননাঙ্গের সঙ্গে লতার উপমা খুবই দ্যোতক। বস্তুত নারীগর্ভে তার সন্তানের বন্ধন যেন লতাপাতারই অমোঘ বন্ধন। সেই বন্ধন ছিন্ন ক'রে তবে পৃথিবীতে আসা। তবু লতার সঙ্গে যেমন ফুলফলের থেকে যায় একটা অলক্ষ সংযোগ তেমনই মানবজীবনের সঙ্গে থাকে লতাসাধনার অচ্ছেদ্য স্মৃতি। নারী তাই সঙ্গিনী অথচ পূজ্য। তার রজঃস্রাব যেন ত্রিবেণীর ধারার মত। সেই ধারাতেই ভেসে আসে শুভযোগে মহামীন অর্থাৎ অধর মানুষ।

অধর মানুষকে যে মৎস্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে তার একটা কারণ সম্ভবত মৎস্য উর্বরতার প্রতীক, আরেকটা কারণ মীন স্বভাবত নিরাশ্রয়, বন্যাবেগে সে এমনকি খাল বিল থেকে নদী হয়ে সমুদ্রসন্ধানী হ'তে পারে। লক্ষণীয় নারীর রজঃ-স্রাবকে দেহতত্ত্বের গানে বলা হয়েছে বন্যা। যেন কল্পনা করা হয়েছে নিরাশ্রয় প্রাণের ঈপ্সা দেহরূপকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে থাকতে চায়। তাই নারীর রজঃস্রোতে অসহায়ভাবে ভাসমান মীন-পুরুষ শুক্রের স্পর্শে জীবনলক্ষণ পেয়ে নারীর জননকেন্দ্রের ষড়দল পদ্মে (পদ্মও উর্বরতার প্রতীক) আশ্রয়

নেয়। জড়িয়ে যায় জীবনলতায়। শুক্র ও রক্তের স্বরূপকে একটি গানে বলা হয়েছে কালা আর বোবা। এবং

পিরিতে পিরিতে সুরীতি ফিরিতে
দেখা হ'ল পথে কালা বোবার সাথে।
বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝারে—
দুই দেশেতে তারা দুইজন বসত করে
কী প্রকারে দেখা রাস্তার মাঝারে।

স্বতন্ত্র দুজনের দেহভাণ্ডের দুই বস্তুর অভূতপূর্ব সাক্ষাৎ সম্ভাবিত করে নতুন এক জীবন-পিণ্ডকে। তার ক্রমবিকাশের বস্তুগত বিবরণটিও লৌকিক কল্পনায় চমকপ্রদভাবে জারিত হয়ে এইভাবে বর্ণিত যে,

প্রথম মাসে মাংসশোণিতময়
দুইমাসে নর নাভী কণ্ঠা অস্থি-র উদয়।
তিনমাসে তিনগুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্ম লোম আনে।
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার
পঞ্চতত্ত্ব এসে তবে করলেন সঞ্চার
সেইদিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয়মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে স্থানে।
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে
এরা আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে।
নয় মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।

গর্ভসঞ্চারের পর পরবর্তী দশমাসে সন্তানের দেহগঠন বিষয়ে কৌতূহলপ্রদ এই দেহবাদী গানে লৌকিক কল্পনার এক চমৎকার বিচ্ছুরণ আছে। খুব বড় ধরনের ফকিরি গানের আসরে দক্ষ ও মননশীল গায়ক এ-জাতীয় গান করেন এবং কথকতার ঢঙে গানের সারার্থ বুঝিয়ে দেন। সেই সুবাদে আমি সনাতনদাস বাউলের কাছে এই পদের যে রকম ব্যাখ্যা শুনেছি তা লিপিবদ্ধ করছি। এর অন্য ব্যাখ্যাও থাকতে পারে কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি একই দেহতত্ত্বের পদের

বাউল-ব্যাখ্যা একরকম, মারফতী-ব্যাখ্যা আর একরকম আবার সহজিয়া-বৈষ্ণব-ব্যাখ্যা অন্য এক রকম। এই ভিন্নতার কারণ হ'লো উপধর্মগুলির মধ্যে তত্ত্ব ও করণের পার্থক্য। যাই-হোক আলোচ্য গানে গর্ভে পাঁচমাস পর্যন্ত শিশুর সাঙ্গপুঙ্খ দেহ উপাদানের গঠন-বিবরণ বেশ সহজ ও সর্বজনবোধ্য। এরপরে শরীরে যে-পঞ্চতত্ত্ব আবির্ভাবের কথা বলা হচ্ছে তার অর্থ পঞ্চভূতের (ক্ষিতি অপ্ তেজ ব্যোম মরুৎ) গুণসঞ্চার, তার থেকেই জীবের আকৃতি আর স্বভাব নিরূপিত হয়। ছ'মাসে ষড়রিপু বলতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। সপ্তধাতু মানে শরীরের রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র। অষ্টসিদ্ধির অর্থ অণিমা মহিমা গরিমা ইত্যাদি। নবদ্বার বলতে দুই কান দুই নাক দুই চোখ এবং মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ (এখানে উল্লেখ করা যাক যে স্ত্রীজননাঙ্গকে দেহতত্ত্বের গানে 'দশমী দ্বার' বলা হয়)। দশমাসে যে দশ ইন্দ্রিয়ের প্রসঙ্গ আছে তার দুটি ভাগ। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ কান নাক জিভ ত্বক এবং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ। দশমাস পূর্ণ হলে এই দশইন্দ্রিয় গর্ভবাসে অস্বস্তি বোধ করে, তখনই সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

এখানে স্বভাবত আমাদের কৌতূহল হ'তে পারে লৌকিক গীতিকারের এই বস্তুগত বিবরণ বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থাৎ শারীরবিদ্যার বিচারে কতখানি সঠিক। সে বিষয়ে অবিতর্কিত কোন মন্তব্য না ক'রে এই জিজ্ঞাসার অন্য একটা দিক বিচার্য। বাংলা দেহতত্ত্বের গানের পেছনে যে বহুবর্গের ধর্মসাধনার সমন্বিত সংগঠন বহুদিন ধ'রে ক্রিয়াপর তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি, সুফীমত, তান্ত্রিক যোগক্রিয়া এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের ভাবনা নানাভাবে এসব গানে ছায়াসঞ্চার করেছে। জানা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের একটি শাখা শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিল। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ সংস্থান এবং যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল। তাঁদের কাছ থেকে এ জাতীয় জ্ঞান লৌকিক বস্তুবাদী সাধকদের সমৃদ্ধ করেছিল এমন অনুমান নিতান্ত

সংগত। বাংলা দেহতত্ত্বের কিছু গানে শারীরবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিবেচনার নানারকম নমুনা পাওয়া যায়।

প্রথমেই দেখা যায় দেহাত্মবাদী কায়াসাধনার একটি বড় ক্রিয়া হ'লো দমের কাজ বা শ্বাসের ক্রিয়া। এই শ্বাসপ্রশ্বাস কেবল যে জীবন ধারণের একমাত্র উপায় তাই নয়, এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণে যৌনজীবন যাপনে সাধকরা বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে থাকেন। দেহবাদী গানে বায়ু বলতে শ্বাসক্রিয়াকে বোঝায়। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে সন্তান কেঁদে ওঠে এবং তারফলে মুখবিবর দিয়ে শ্বাসবায়ু বা অক্সিজেন টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের মত চুপ্‌সে-থাকা ফুসফুস পূর্ণ হয়ে আবর্তিত হ'তে থাকে। বায়ু সেইজন্যই দেহতাত্ত্বিকদের গানে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি এতদূর বলা হয়েছে,

> মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে
> দ্যাখ নারে সব হাওয়ার খেলা
> বন্ধ হ'তে দেরি কি হবে ?
> বন্ধ হ'লে এ হাওয়াটি মাটির দেহ হবে মাটি।

আরেকটি গানে দম বা শ্বাসক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে খুবই অভিনব বিশেষণে—

> তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
> সেই তো তোমার গুরু বটে
> সে যে আছে দেহের মাঝে
> তারে ভালোবাসো অকপটে !

শ্বাসকে কেন 'গুরু' বলা হয়েছে তা বোধগম্য হয় গানের অন্তরা-য় পৌঁছালে—

> করিলে তাঁর সাধনা সকলই যাইবে জানা
> হবে না আর আনাগোনা এ ভব-সংসার সংকটে।

এইটাই সার কথা। শরীরে শ্বাসের কাজ কি তা বুঝতে হবে এবং সেই শ্বাসকে নিমন্ত্রণ করতে পারলে দশমী দ্বারে আর পতন ঘটবে না। অর্থাৎ গুরু বা দমের কাজকে নিজ দেহে যথার্থভাবে কায়েম করতে পারলে বিন্দু পতনের

অনিবার্যতা নিবারিত হয়ে সাধক মুক্ত হয়ে যাবেন। তাঁর আর সন্তানসন্ততি হবেনা, জড়িয়ে পড়বেন না সংসার সংকটে। ফকিরি মতে সন্তাননিরোধ অবশ্যকৃত্য। লৌকিক বড় বড় যাঁরা সাধক ও গীতিকার (যেমন লালন বা কুবির, হাউড়ে বা রশীদ) তাঁদের নিজের সন্তান নেই। শিষ্যদেরই তাঁরা বলেন শিষ্যশাবক। সন্তানজন্ম বিষয়ে নিষেধাত্মক একটি গানে বলা হয়েছে,

শরিক কোরোনা রে মন করি বারণ
শরিকে বড় জ্বালা বারে বারে হবে জনম।
নিজ বীর্যে পুত্রকন্যা জন্ম দিয়ে শেষে কান্না
কন্যাপুত্রের দিয়ে ধন্না বেড়াবে রে মন।
তাহারেই পুনর্জন্ম লালন সাঁই ফুকারিলে
শরিকের উল্টোকলে পড়ো না কখনও।

সন্তান জন্ম তথা অকারণ বীর্যক্ষয় বিষয়ে দেহাত্মবাদীরা অত্যন্ত সতর্ক। তাঁদের একটি গোপ্য সাধনার নাম বিন্দু সাধন। যাঁরা বিন্দু সাধনে ব্রতী নন, সন্তান জন্মের অতি-প্রজতায় দারিদ্র্য দুঃখ আর স্বাস্থ্যহীনতায় বিড়ম্বিত হ'য়ে ঈশ্বরের দোহাই পারেন তাঁদের উদ্দেশে গানে বলা হয়েছে,

আপন হাতে জন্ম মৃত্যু হয়
খোদার হাতে হায়াৎ মউৎ কে কয়?
বীর্যরস ধারণে জীবন
অন্যথায় প্রাপ্তি মরণ
আয়ুর্বেদ করে নিরূপণ করি নির্ণয়।
নিজে বীর্য ক্ষয় করে
পশুর মত পথে পড়ে
কতজন যায় মরে খোদার দোষ দেয়॥

এই গানের যে তীব্র বিদ্রূপ তা দেহতত্ত্ববাদের গানে একধরনের সমাজ বোধের পরিচয় বহন করছে। অন্য কোন কোন গানে শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। যেমন একটি নমুনা,

এমন উল্‌টো দেশ গুরু কোন জায়গায় আছে

'উধ্ব'পদে হেঁটমুণ্ডে সেই দেশে
লোক বাস করতেছে।
'সেই দেশের যত নদনদী
'উধ্ব'দিকে জলস্রোতে বয় নিরবধি
'আবার নদীর নীচে আকাশ বায়ু
তাতে মানুষ বাস করতেছে।
'সেই দেশে যত লোকের বাস
মুখে আহার করে না কেউ নাকের নাই নিঃশ্বাস
তারা মলমূত্র ত্যাগ করে না
আবার আহার ক'রে বাঁচতেছে।

ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে এই দেশটি মাতৃজঠর। সেখানে চন্দ্রসূর্য নেই। গভীর অন্ধকারে উধ্ব'পদ হেঁটমুণ্ডে মানব সন্তান অবস্থান করে। উল্টো অবস্থানের জন্য দেহের রক্ত সঞ্চালন ঘটে উল্টো-ভাবে। গর্ভস্থ শিশু নিঃশ্বাস নেয়না বা মলমূত্র ত্যাগ করেনা। জননীর মাতৃনাড়ি বা অ্যাম্বেলিকাল কর্ডের সাহায্যে শিশু তার আহার করে। কাজেই প্রহেলিকার মত ক'রে লেখা এই গান আসলে সূক্ষ্ম দেহসত্যকেই প্রমাণ করছে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এমন আরেকটি গানের নজির এখানে উদ্ধার করছি।

আট কুটুরি নয় দরজা কোনখানে নাই তালা
ঘরখানি হয় তিনতলা।

এখানে আট কুটুরি বলতে মানবদেহের আটটি প্রধান রসস্রাবী গ্রন্থির কথা বলা হচ্ছে যাদের পারিভাষিক নাম ১. পিটুইটারি ২. থাইরয়েড ৩. প্যারা থাইরয়েড ৪. থাইমাস ৫. অ্যালড্রিনাল ৬. প্যাংক্রিয়াস ৭. প্যারোটিড এবং ৮. টেসটিস / ওভারিস। এই গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ বা হর্মোন সিক্রিশনের ফলে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। আট কুটুরির সঙ্গে নয় দরজা বা নবদ্বার অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তিনতলা বলতে বোঝানো হয়েছে কটিদেশের উধ্ব'ভাগ, নিম্নভাগ এবং মস্তিষ্ক, শারীরবিদ্যার ভাষায় থোরাসিক রিজিয়ন, লাম্বার রিজিয়ন এবং ব্রেইন। গানের পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে,

ঘরের নয় দরজায় নয়জন দ্বারী

সদাই তারা ঘুরে ফেরে

ছয় ডাকাতে জাগলে পরে তখন করবে চুরি।

এখানে নয় দরজায় অর্থাৎ নাক কান চোখ মুখ পায়ু উপস্থের নজন অদৃশ্য প্রহরীর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই নবদ্বার স্নায়ুশক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের বলে সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ু। ছয় ডাকাত এখানে ছয় রিপু। তাদের নিরস্ত করা সম্ভব স্নায়ু ও শ্বাসের সাহায্য।

গানের শেষ অংশ,

উপরের তলায় কোর্ট কাচারি

মাঝের তলায় মন ব্যাপারী

নীচের তলায় কর্মচারী

ধ্যান করে জপের মালা।

এখানে উপর তলায় কোর্ট কাচারি বলতে মস্তিষ্ক ও তার কাজের কথা বলা হয়েছে। মাঝের তলায় মন বলতে হৃদয় বোঝায়, যা স্নেহ ভালবাসা স্পর্শকাতরতা ইত্যাদির কারক। নিচের তলায় কর্মচারী বলতে পাকস্থলী, পিত্তস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা-এরা সর্বদাই কর্মতৎপর। মালা-জপা বলতে রিদ্‌মিক কনট্রাকশন বোঝাচ্ছে।

দেহতত্ত্বের কোন কোন গানে নানা রকম শহর গ্রামগঞ্জ জনপদের নাম রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন গানে ঢাকা শহর শব্দটি থাকলে বুঝতে হবে শরীরের গোপনাঙ্গের ইঙ্গিত। তেমনই শান্তিপুর মানে সাধকের মনের শমতা, নবদ্বীপ মানে নবদ্বার, স্বরূপগঞ্জ মানে স্বস্থিত অবস্থা, দেবগ্রাম বলতে যেখানে দেহক্ষয় ঘটে, গুপ্তিপাড়া গুহ্যদেহের প্রতীক, আখেরিগঞ্জ অর্থে মৃত্যু। কলকাতাকে নিয়ে একটি সাংকেতিক গান আছে যার সারার্থ ভাঙলে মানবদেহের নানা ইঙ্গিত পাই। গানটি এইরকম—

তার বাইরে আলো ভিতরে আঁধার

মানবদেহ কলিকাতা অতি চমৎকার।

চৌষট্টি গলির মাঝে ষোলোজন প্রহরী আছে

তিনশত ষাট নম্বরে হয় রাস্তা বাহাত্তর হাজার।

এর দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হ'লো, মানবদেহের ভিতর গভীর অন্ধকার কিন্তু দেহের বাইরের জগৎ আলোকময়। চৌষট্টি গলির তাৎপর্য হ'লো রক্তবাহী প্রধান ধমনী, যার সংখ্যা চৌষট্টি। ষোলোজন প্রহরী বস্তুত শরীরের ষোলোটি ভালব্। তারমধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডে চারটি এবং দেহের অন্তপ্রান্তে বারোটি ভাল্‌ব্ শিরার মধ্যে রক্তের একমুখী প্রবাহে তাদের কাজ সম্পাদন করে। এই রক্তপ্রবাহ হৃদ্‌পিণ্ড থেকে নির্গত হয়ে চোষট্টি ধমনী পার হ'য়ে ক্রমে তিনশত ষাট শিরার মধ্য দিয়ে ধাবিত হ'য়ে বাহাত্তর হাজার উপশিরা ও স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

গানের পরের অংশ :

মেজাজ খারাপ মির্জাপুরে লালবাজারে নিশান উড়ে
বউবাজারে গেলে পরে প্রাণে বাঁচা বিষম ভার।
চিড়িয়াখানা যাদুঘর মণিমঠ মহলের ঘর
বেলুড়মঠে কালীঘাটে আছে তিনজন অবতার
চিন্তাগারদ আলিপুরে হাটখোলা হুগলীধারে
খিদিরপুরে থরে থরে ঘাটে বাঁধা ইস্টিমার।

গানের গূঢ়ার্থ ভেদ করলে বোঝা যাবে মির্জাপুর অর্থে দেহের স্পর্শকাতর অঞ্চল যা মির্জা বাদশার মেজাজের মত। লাল বাজার হ'লো রক্ত আদানপ্রদানের কেন্দ্র অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ড। বউবাজারের অনুষঙ্গ গণিকালয়ের সূত্রে অর্থাৎ শরীরের গোপ্য স্থান। চিড়িয়াখানা হ'লো কুপ্রবৃত্তির আশ্রয়স্থল। যাদুঘর বলতে পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা, মানবশরীরে যেমন মস্তিষ্ক, অজস্র সঞ্চয় সেখানে। বেলুড়মঠ আর কালীঘাটের তিন অবতার আসলে শরীরের ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। আলিপুরের জেলখানায় যেমন বন্দী থাকে কয়েদীরা, মানুষের দেহাভ্যন্তরে বা মনে থাকে চিন্তারা বন্দী হয়ে। হুগলী নদীর তীরে হাটখোলার মত খোলামেলা এই দেহঘর। খিদিরপুরের ডকে যেমন স্টিমার বাঁধা থাকে তেমনই মানবদেহে কামনা বাসনার অজস্র তরী সংযমের রজ্জু দিয়ে বাঁধা।

দেহতত্ত্বের গানে এই যে প্রহেলিকার চাতুর্য আর সন্ধা

ভাষার ব্যবহার কিংবা অর্ধআবৃত সংকেত তার মূলে রচয়িতার সৃজনদক্ষতা নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু গানগুলিকে আলো-অঁাধারি ক'রে রাখার পিছনে সামাজিক কারণও আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এরা অন্ত্যজ এরা মন্ত্রবর্জিত' কিন্তু বলেননি এরা যুগে যুগে উচ্চবর্ণের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত। আলেম মুসলমান আর নৈষ্ঠিক হিন্দু বারেবারে দেহাত্মবাদীদের নিপীড়ন করেছে, ভেঙে দিয়েছে তাদের একতারা, পুড়িয়ে দিয়েছে আখড়া। মানুষগুলি তাই গভীর অভিমানেই কি তাঁদের গানে আনলেন রহস্যের ধূসরতা আর শব্দের আবরণ? তা কেবল অবারিত রইলো মুষ্টিমেয় মরমীদের হৃদয়ে? এটা একটা সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে। আরেকটি কারণ হ'তে পারে গুরুবাদ। অর্থাৎ গানগুলির তত্ত্বব্যাখ্যার দায়িত্ব যাতে গুরুসম্প্রদায়ের হাতে থাকে তার জন্যই গানের শরীরে এক ধরনের সচেষ্ট দুরূহতা আরোপ করা হয়েছে হয়ত। তবে সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত গুহ্য গোপন তত্ত্ব সরাসরি বলা যায় না ব'লেই এই রূপক-প্রতীক-শব্দঘটিত গূঢ় প্রয়োগ এ-সব গানকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। তাতে একটা মস্ত বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, সাধারণ শ্রোতারা দেহতত্ত্বের গানকে বহুসময় কৌতুকের বা রঙ্গের গান ব'লে গ্রহণ করেছে। 'দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে' বা 'ড্যাঙায় ডিঙে চালায়' বা 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম' জাতীয় গভীরার্থক প্রকাশভঙ্গী সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে গ্রাম্য গানের এক ধরনের তামাসা ব'লে। সেই মনোভাব থেকে গানগুলিকে উদ্ধার করা শক্ত। কারণ দেহতত্ত্বের গান এখন শহুরে যুবাদের বিনোদনের বিষয়। ক্যাসেট, রেকর্ড, দূরদর্শন ও কেঁদুলীমেলায় দেহতত্ত্বের গান না-বুঝে-শোনা এখন নাগরিক ফ্যাশন। সাধনহীন বাউল গায়কও অনেক পাওয়া যায়। গান গাওয়া যাদের জীবিকা।

এই কারণেই নতুনভাবে দেহতত্ত্বের গান রচনার ধারা কমে আসতে বাধ্য। জীবন যাপনের সৎ আর স্বতঃস্ফূর্ত উৎস থেকেই তো এ সব গান বারেবারে উৎসারিত হয়েছে। এখন বাংলায় তেমন বড় মাপের কায়াসাধক নেই, তেমনই

গীতিকারও নেই। আছে খানিকটা গানরচনার পৌনপুনিক একঘেঁয়েমি আর ক্লিশে। বাংলা দেহতত্ত্বের গানে আজ আর প্রাণস্পর্শিতার তেজ নেই। কিন্তু কয়েকশো বছর ধ'রে গড়ে-ওঠা দেহতত্ত্বের গীতি সংকলনে গ্রামিক বাঙালীর এক সমৃদ্ধ জীবনসত্যের ইতিহাস আছে।

দুই

দেহতত্ত্বের গান আমাদের দেশে দুই ধরনের সাধকবর্গ লিখেছেন। যাঁরা কায়াসাধক আর যাঁরা মরমিয়া। এই দুই বর্গের সাধকই নিজেদের 'সহজ' পথের পথিক ব'লে আখ্যাত করেছেন। বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব বা মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের সহজমার্গের ধারণার পার্থক্য কি এবং মিলই বা কতটুকু সে বিচারে যাওয়া জরুরি হয়ত নয়। কিন্তু এই কথাটা বুঝে নেওয়া খুব দরকার যে, উচ্চবর্ণের দেবদেবী পূজার সমান্তরালে দেহ-চেতনাবহুল এই গুহ্য সাধনার বিশিষ্টতা গ'ড়ে উঠলো কী ক'রে। কিছু মানুষ মনে করেন মূর্তিপূজা হিন্দু ধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র বা সাধকদের জীবনধারা থেকে তা প্রমাণিত হয় না। বেদ-উপনিষদে মূর্তিপূজা নেই, সাংখ্যবেদান্ততেও দেবতার পরিকল্পনা নেই। পুরাণেই প্রথম দেবদেবী পরি-কল্পনার আভাস জাগে। অদ্বৈতবাদের ঝোঁক ছিল দেবতাকে জানা নয়, নিজেকে জানা। আমাদের মরমিয়া সহজ সাধকরা তাঁদের স্বাভাবিক ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই আত্মোপলব্ধির পথকে প্রাধান্য দেন। বাঙালী সহজিয়ারা বহুদিন আগেই বলে গেছেন,

আপন শরীরতত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই তো পরমযোগী শাস্ত্রের বচন॥

এর পরের কথাটি হ'লো,

নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।

অর্থাৎ অন্তরের শমতা তথা আত্মোপলব্ধির পথ হ'লো নিজের শরীরতত্ত্বকে জেনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। এ থেকে বোঝা

গেল আত্মোপলব্ধির অর্থ হলো নিজের শরীর আর তার অভ্যন্তরের নাড়ী, শ্বাস ও চক্রের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রাণ ও আত্মাকে বুঝে নেওয়া। এ ব্যাপারে সাধনার দুটি পথ হ'লো স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া মানে সকাম এবং পরকীয়া মানে নিষ্কাম সাধনা। অর্থাৎ স্বকীয়াকে আশ্রয় ক'রে পরকিয়ায় পৌছানোই সহজ সাধনার লক্ষ্য।

দেহবাদীরা সত্যিই বিশ্বাস করেন যে 'লজ্জা ঘৃণা ভয় / তিন থাকতে নয়', তাই শরীরের বর্জ্য পদার্থ তাঁরা বিনা সংকোচে পান করেন। তাকে বলে চারিচন্দ্র সাধন। চন্দ্র শব্দটি দেহবাদীদের পক্ষে খুব দ্যোতক। স্বর্গচন্দ্র আর দেহ চন্দ্রকে এক করাই তাঁদের কাজ। তাঁদের বিশ্বাস, মানব-শরীরে সাড়ে চব্বিশচন্দ্র আছে। বিশেষ চন্দ্রসাধনে জন্ম মরণ রোধ করা যায়। গানে বলা হয়েছে,

দেহের তত্ত্ব জানবি তবে আগে গুরুর চরণ ধর
পাবি রে তুই নিত্যদেহ চারিচন্দ্র সাধন কর।

নিত্যদেহ লাভ করার অর্থ জ্যান্তে-মরা। সাধক সেই অবস্থায় পৌছাতে চান। এই জ্যান্তে-মরার তত্ত্বটি পারস্য থেকে সূফীসাধকদের সূত্রে বোধহয় এদেশে এসেছে, অবশ্য ভারতীয় সাধনাতেও অচঞ্চল মনের আকাঙ্ক্ষা আছে। সেখানে বলা হয়,

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।

অর্থাৎ মন যখন চঞ্চলতাহীন তখনই তাকে মৃত বলা যায়। একেই বলে জ্যান্তে-মরা। বলাবাহুল্য শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে স্ববশে আনলে মনকে অচঞ্চল করা সম্ভব। আরেক উপায় হ'লো প্রকৃতি থেকে পাঠ গ্রহণ। যেমন পৃথিবী থেকে শিখতে হবে সহিষ্ণুতা, আকাশ থেকে অসীমতা ও নির্লিপ্ততা, চন্দ্র থেকে শান্তি, সূর্য থেকে তেজ ও প্রকাশধর্মিতা, জল থেকে মালিন্যহরণ ও তাপহরণশক্তি, পবন থেকে সদামুক্ত গতি। অর্থাৎ পৃথিবীর মূলীভূত উপাদানকে শরীরে স্বীকরণ।

যাইহোক চন্দ্রতত্ত্বের যে প্রসঙ্গ আগে করা গেছে তার সুবাদে বলা হয়েছে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের কথা। এঁদের

বিশ্বাস মানবশরীরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে, যথা—

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব ওই
হাতে দশ পায়ে দশ গণ্ড স্থলে দুই।
অধরে ললাটে দুইটি অর্ধচন্দ্র তার উপর।

এই চন্দ্রবহুল মানব শরীর নিয়ে যখন পুরুষ নারী সংগত হয় তখনই তাকে বলা যায় 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'।

এছাড়া চারিচন্দ্রের অন্যধরণের ব্যাখ্যাও আছে। একটি গানে রয়েছে—

চারিচন্দ্রের জান রে সন্ধান
একটি গরল একটি উন্মাদ রোহিণী আর বাণ।
গরলেতে আছে সুধা জেনে লওরে তার খবর।

এখানকার ভাষ্য বেশ গুহ্য। নারীর রজস্নানের চারটি দিনে রজের নামান্তর দেহবাদী সাধকদের কাছে যথাক্রমে গরল উন্মাদ রোহিণী ও বাণ। 'গরলেতে আছে সুধা' বলতে বোঝানো হচ্ছে রজোপ্রবৃত্তির প্রথম দিনের শেষে এবং দ্বিতীয় দিনের শুরুতে জোয়ার আসে। সেই জোয়ারের নাম অমাবস্যা। আর সেই ঘোর অমাবস্যার যোগে মহামীনরূপে অধর মানুষ বা অটল মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তাকেই ব'লে 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়'। এটাই দেহসংযোগের শ্রেষ্ঠ লগ্ন।

একজন গীতিকার এই গুহ্য মন্ত্রসাধনের তত্ত্ব গানের বাণীতে সাবলীলভাবে বলেছেন,

তিনটে রসের সাধন যে জানে
সেই পাবে নিরঞ্জনে—
গরল সুধা মিলন ক'রে সুধার মিলনে।
পদের [প্রতিপদের] শেষে দ্বিতীয়ার প্রথমে
রত্ন মেলে তিনরস মিলনে।

নারী শরীরের এই রসস্রাবের চারদিনকে গানে নানা প্রতীকে ব্যক্তিত করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত প্রতীক হ'লো ফুল, যা উর্বরতার প্রতীক। বহু গানে আছে আবের [জলের] গাছে ফুল-ফোটার তত্ত্ব। সেই ফুলের

চার দিনে চার রং। সিয়া (কালো) সফেদ (সাদা) লাল ও জরদ (নীল)। মারফতী ফকিরদের সব সাধনতত্ত্ব ও বিশ্বাস দেহ ঘিরে গোপন সাধনার মধ্যে ব্যক্ত হয়। তাই তাঁরা এই চার ফুলের একটি অন্তর্গূঢ় ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে সিয়া মানে 'আলেফ', সফেদ মানে 'হে', লাল মানে 'দাল' এবং জরদ মানে 'মিম্'। এই চার হরফ একত্র করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আহম্মদ। আহম্মদ অর্থে দেহ। আহাদ মানে মহাপ্রাণ, তারই সাকার রূপ আহম্মদ। অর্থাৎ এই সাকার মানবদেহেই রূপ নিয়েছেন আল্লা।

মারফত কথার অর্থ গোপন দেহসাধনা। তা শরীয়তের (অর্থাৎ কলমা, নামাজ, রোজা, যাকাৎ ও হজ) প্রকাশ্য সাধনার বিরোধী। মারফতীরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লার সঙ্গে যখন নবীর মিলন হয়েছিল তখন নব্বই হাজার কথা জারি হয়েছিল। তার মধ্যে তিরিশ হাজার কথা প্রকাশ্য ('জাহির') এবং ষাট হাজার কথা গোপন ('বাতুন')।

মারিফত বিচার বিচার কর বসিয়ে শারিয়তের কোলে
ষাইট হাজার গোপনের কথা নিষেধ করেছেন রসুলে।

এই গোপন কথার অনেকগুলি ঠারেঠোরে প্রতীকে দেহতত্ত্বের গানে ভরা আছে। একমাত্র মারফতী মুর্শিদ (গুরু) তাঁর একনিষ্ঠ মুরিদকে (শিষ্য) এ সব শব্দের ব্যাখ্যান করেন পরিবেশ ও অধিকারীভেদমত। সম্ভবত এই কারণেও এ-জাতীয় গানে একটা আবরণের দরকার হয়েছে। তবু তাঁদের বিশ্বাসের সার কথা হলো আগে 'খদ্' (দেহ) জানলে তবে খোদাকে জানা যাবে। নামাজী হাজী কলেমায় বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান শরীয়ৎপন্থী মুসলমানদের (তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) পক্ষে মারফতীদের এই 'বাতুনে' তত্ত্ব খুব রোচক নয়। তাই যুগে যুগে শাস্ত্রবাদী শরীয়তীদের সঙ্গে দেহবাদী গুহ্য সাধক মারফতীদের অন্তহীন সংগ্রাম। সংগ্রাম সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে নৈষ্টিক বৈষ্ণবদেরও। কারণ সহজিয়া ধারা দেহসাধনার গুহ্য বিশ্বাসে আস্থাশীল। তাঁরাও মনে করেন সাধনার দুটি পথ—'অনুমান' ও 'বর্তমান'। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ-রাধা-

বৃন্দাবন-দ্বাদশ গোপাল-ষড় গোস্বামী এসবকে সহজিয়ারা অনুমান ব'লে উড়িয়ে দেন। যা চোখে দেখা যায় না, যা 'আন্দাজী', যা পুঁথির পাতায় শুধু আছে তাতে বিশ্বাস কি ? তারচেয়ে নিজেদের বর্তমান-সাধনায় সহজিয়ারা সাধক সাধিকার নিজ দেহেই কৃষ্ণ রাধা বৃন্দাবন ইত্যাদিকে বুঝে নিতে চান। তাঁদের কথাটা অনেকটা এইরকম যে,

কানে কানের কথা শুনে সন্দেহ জেগেছে প্রাণে
লেখা কথায় পাই কেমনে কোন্ কথা রয়েছে মূলে।
লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করলেই বুঝবে সারাসার।

লেখা ছেড়ে দেখাকে বড় করার অর্থই হ'লো শাস্ত্রের চেয়ে দেহকে বা আত্মকে প্রাধান্য দান। ফকিররাও ছাপা কেতাবের চেয়ে 'দেল-কেতাব' পড়ার নির্দেশ দেন। যাইহোক, সহজিয়া বৈষ্ণবদেব উদ্দেশ্যে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা ভ্রষ্ট, বিকৃত, বামাচারী, সহজে, নেড়ানেড়ি, এসব অপবিশেষণ দিয়েও শোধন করতে পারেননি। দেহকেই তাঁরা গুপ্ত-বৃন্দাবন ব'লে মনে করেন। নিজ দেহের মধ্যেই কৃষ্ণ রাধাকে আরোপ করেন। শরীরের সর্বকেন্দ্রে সহজিয়ারা খুঁজে পান দেবদেবী ও অবতারদের। যেমন—

চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্ম করে স্থিতি
কপাল মাঝে মহাবিষ্ণু করেন বসতি।
চক্ষেতে কালাচাঁদ ব'সে করে ধ্যান
নাসিকায় নিত্যানন্দ মধু করে পান।
কর্ণেতে চৈতন্য সদা করিছে সাবধান
আলজিহ্বে আহ্লাদিনী গায়ে গঙ্গাধাম।
জিহ্বা নিচে সরস্বতী বাক্যাদি যোগান
ডান হস্তে কানাই আর বামে বলরাম।
হস্তপদ বক্ষমাঝে জগন্নাথের বসতি
নাভিমূলে গৌরব্রহ্ম প্রেমের শকতি।
লিঙ্গে মহাদেব আর গুহ্যে ভগবতী।

এ-জাতীয় রচনা সহজিয়া পদে অনেকরকম আছে। এই সব কিছুর লক্ষ্য একটি—সাধককে অনুমান থেকে বর্তমানের দিকে

আকর্ষণ করা। শাস্ত্র মূর্তি শঙ্খ ঘণ্টা মন্দির ধূপ দীপ আর নানারকম ভাবাত্মক সাধনার বদলে বস্তুবাদী সাধনার পথে গোপন ভুবনে প্রবেশ করানো। সেখানে 'হাবার কথা কালা বোঝে' (রজ বীর্যের ইঙ্গিত), সেখানেও প্রতিপদের চন্দ্র আর দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয় ঘটে। সেখানেও নামান্তরে রয়েছে 'নীলচন্দ্র লালচন্দ্র শ্বেতচন্দ্র ঘটা / হিঙ্গুলবরণ চন্দ্র তার শশী গোটা গোটা'। ধর্মধারণা আর তার রূপায়ণে দেহকে অগ্রাধিকার দানের অন্তঃশীল রহস্যময়তার সূত্রে সহজিয়া মারফতী কর্তাভজা সাহেবধনী ও বাউলদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

ঘনিষ্ঠতার এই সূত্র জেগে উঠেছে উপধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাসের জোরে। এঁরা সবাই দুটি কথার উপর খুব জোর দেন। প্রথমত এঁরা মানেন যে দেহের কোন জাত নেই এবং দ্বিতীয়ত এঁরা মানুষকে সবচেয়ে বড় স্থান দেন। স্থান দেন শাস্ত্র মন্ত্র ধর্ম আচরণ ও শ্রেণীর উপরে। সেইজন্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৈষ্ণব কারুর মধ্যে এঁরা ভেদবুদ্ধি আনেন নি। অসাম্প্রদায়িকতার এমন ব্যাপ্ত বোধ ও মানবিকতার ধারণা আমাদের সগর্ব সম্পদ। আমাদের বড় বড় উচ্চবর্গের ধর্ম যখন পরস্পর বিবদমান এবং শ্রেণী ও পংক্তিতে বিভক্ত তখন এই দেহাত্মবাদী পল্লীবাসী অর্ধশিক্ষিত গীতি-কাররা এমন গাঢ় মিলনমন্ত্র তাঁদের গানে বেঁধেছেন যে সম্ভ্রম জাগে। এমন কিছু গানের পংক্তি আপাতত উদ্ধার করা যায় আমার বক্তব্যের সমর্থনে—

১. রাম কি রহিম করিম কালুল্যা কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা
এক চাঁদ জগৎ উজ্জলা।

২. একের সৃষ্টি সব পারিনা পাকড়াতে
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

৩. করিম-রহিম রাধা-কালী এ-বুল সে-বুল যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে
মানবদেহে থেকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে।

৪. হিন্দু কিবা মুসলমান শাক্ত বৌদ্ধ খৃশ্চিয়ান
বিধির কাছে সবাই সমান পাপপুণ্যের বিচারে।

৫. অজ্ঞ মানুষ জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে।
শিয়াল কুকুর পশু যারা একজাতি একগোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।

৬. কহিছে বিন্দুযাহ্ তুমি চোর তুমিই সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু।

৭. পুরুষ নারী দুই জাতি দেখে কেন দেখনা।

অজস্র বিচিত্র গানের এই সব সদুক্তি যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কায়াবাদী ব'লেই কি এমন সুস্থ প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়ান নি? বাউল যেমন তাঁর সত্য জেনেছেন 'দেল-কেতাব' থেকে তেমনই মধ্যযুগের সন্তসাধক জেনেছেন:

কায়া কতেব বোলিয়ে লিখী রাখূঁ রহিমান।
মনবাঁ মুল্লা বোলিয়ে সুরতা হ্যায় সুবহান॥

[দাদূ, সাচ কৌ অঙ্গ, ৪১]

অর্থাৎ কায়াকেই বলো কোরান, পরম দয়াল তাতে লেখেন, মনকেই বলো মোল্লা, সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরই তা শোনেন।

শরীর থেকে জীবন সত্যের এমন আহরণ, স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন এ দেশে বারে বারে ঘটেছে। একেই বলে আত্মতত্ত্ব। লক্ষ করা যায় উচ্চবর্ণের মানুষ বড় একটা এমনতর মরমিয়া শরীরী সাধনার সত্যে পৌঁছোতে চান নি। কিংবা উচ্চতর শ্রেণীবর্ণই হয়তো তাঁদের প্রতিবন্ধক হয়েছে মাটি-ঘেঁষা জীবনের রূপ-দেখার ব্যাপারে। তাঁরা অধিকতর আস্থা রেখেছেন পুরোহিত বা মোল্লাতন্ত্রে, পুরাণ বা কোরাণে, মন্দিরে বা মসজিদে। আর সেই অলস আস্থার প্রত্যয় ভেঙে দিয়েই দেহাত্মবাদীদের সংগ্রামের সূচনা ঘটেছে অনুমান থেকে বর্তমানের যাচাই করবার কঠিন পথে। 'ভুলোনা বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়' বলেছেন একজন প্রতিবাদী গীতিকার বেদের অপৌরুষেয়তার বিরুদ্ধতা ক'রে। একেবারে অবমানিত

সামাজিক অবস্থানই কি তাঁদের সত্যদৃষ্টি ও স্বচ্ছ মানবিক বোধে উত্তরিত করেছিল? একথাই সত্য ব'লে মনে হয়, যখন দেখি, আমাদের লালন-দুদ্দু জালাল যাদুবিন্দু কুবিরের জন্ম খুব নিচুবর্গের শ্রমজীবী ঘরে। এ কথার বৃহত্তর সমর্থন পাই মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত সাধকদের জীবন ও রচনা পর্যালোচনা করলে। কবীর ছিলেন জাতে জোলা, রুইদাস চামার, গুরুহংস জাতে ধোপা। দাদূ ছিলেন ধুনকর, রজ্জব ছিলেন কলাল (মদ্য বিক্রেতা), নামদেব ছিলেন জাতে ছিপাঁ (বস্ত্ররঞ্জক)। হীন জাতি বা বংশধারা এই সব ভাবসাধকের জীবনে কোন বাধা আনেনি বরং জীবন ও জগৎ অনেক স্বাভাবিক সমতলে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখেছিলেন। কবীর-দাদূ-রজ্জব সাধক-পরম্পরা আমাদের জন্য রেখে গেছে যে অজস্রবিধ গানের উত্তরাধিকার তার সঙ্গে বাউল বা সহজিয়াদের গানের সত্যে বা তত্ত্বে খুব ফারাক নেই। শ্রেণীগত অবস্থানের সাম্যই বোধহয় তার কারণ। আরেক কারণ এঁরা সবাই কায়াবাদী। রূপক অলংকারে রাঙানো দেহতত্ত্বের গান কবীর বা দাদূর কিছু কম নেই। হিন্দু মুসলমান মিলনমন্ত্রের গানও তাঁদের প্রচুর। দেহ ও জীবনের অনিত্যতা বোধ, গুরু-করণের অবশ্যম্ভাবিতা, শাস্ত্রবিরোধিতা এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মানবপ্রেম এঁদের সকলের জীবন ও গানের মূলকথা। সারা ভারতের দেহতত্ত্বের গান একসঙ্গে সংকলিত হ'লে ভারতীয় নিম্নবর্গের এক সমৃদ্ধ জন-ইতিহাস পাওয়া যাবে।

তিন

বাংলা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিলে তার থেকে একটা অনতিলক্ষ কাহিনীবৃত্ত আর দর্শন খুঁজে নেওয়া যায়। তাঁদের বিশ্বাস মনুষ্যেতর চৌরাশী লক্ষ যোনিভ্রমণের পর শেষপর্যন্ত মনুষ্যজন্মের দুর্লভ সৌভাগ্য আসে। পিতার মস্তকে শুক্ররূপে থাকে সন্তান। তারপরে শুভযোগে মাতৃগর্ভে শুক্রশোণিতে মিশে সন্তানজন্মের সূচনা ঘটে। তার পূর্ণগঠন

আর ইন্দ্রিয়বোধ জাগতে পুরো দশমাস লেগে যায়। তখন পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় শিশুকে চেতনশীল করে। সে তখন সৃষ্টিকর্তাকে বলে, 'মুক্তি দাও এই অন্ধকার থেকে। বাঁচাও এই রুদ্ধতা থেকে। এ যে শোণিতময় পিচ্ছিল।' স্রষ্টা তখন বলেন, 'জন্ম হ'লে কি করবে মনে থাকবে তো?' গর্ভস্থ শিশু বলে, 'মনে থাকবে। করবো মানুষভজন। সংযত নির্বিকার থাকবো। কামনা বাসনার দাস হবো না।' কিন্তু সে সঙ্কল্প থাকে না। প্রসবের সময় আগে বেরোয় মুণ্ড, তাই চোখ খুলতেই তাতে মায়ার ঝাপট লাগে। সে কেঁদে ওঠে—

এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদছে প'ড়ে ভূতলে
সে কাঁহা কাঁহা কাঁহা বলে
জীবের সম্বন্ধ তাই ঠিক থাকে না।

তার মানে তার মূলে ভুল ঘটে যায়, অন্ধকার আর আলোর জগৎকে মেলাতে না পেরে সে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠে। বলে কাঁহা কাঁহা, অর্থাৎ কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম; কোথায় গেল আমার স্রষ্টা? তখন জননী তার মুখে দেয় স্তন। অসহায় শিশু কিন্তু সেই স্তন আঁকড়ে ধরে দেন টান। দুধের ক্ষরণে পঞ্চভূত শরীরে কায়েম হয়, জাগে কামনা মায়া আর আসক্তি। ভেসে যায় তার প্রতিজ্ঞা। গীতিকার তাই সচেতন ক'রে বলছেন,

মন রে সেইদেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ।
মিছে মায়ায় ভুইলে রইলে
যাবার উপায় কি করেছ?

বস্তুত মানুষের জীবন তো ধারাবাহিক মায়াবদ্ধতার ইতিহাস। সংসার, নারীদেহ, সন্তান, প্রতিষ্ঠা. উচ্চাশা, মায়া-মোহ আর আত্মপ্রেমে তার বদ্ধতা এসে যায়। সবচেয়ে বড় জড়ত্ব আসে আত্মতত্ত্বকে ভুলে। অর্থাৎ কে আমি, কেন আমার জন্ম, কি আমার করণ তা বিস্মৃত হয়। দেহের উপর মায়া আসে, সন্তানের জন্ম মায়া জাগে, শিশ্নোদরপরায়ণতা আসে। জীবন যে কত অনিত্য, মৃত্যুর পর যে দেহের গর্ব গুমোর

কিছুই থাকে না সেই বোধ থাকে না। তখন তার আধ্যেন্দ্রি চেতন ঘটাতে হয়, মনঃশিক্ষা দিতে হয়, দীক্ষা আর শিক্ষা গুরুকে সংগ্রহ ক'রে মন্ত্রাশ্রয় নিতে হয়। তবে যদি মুক্তি ঘটে। দীক্ষাগুরু দেন ইষ্টমন্ত্র। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শিখতে হয় দেহবাদী সাধনভজন, দমের কাজ, সন্তান নিরোধের শরীরী কৌশল। আত্মতত্ত্ব না জাগলে অর্থাৎ জীবন পরিণামের অসহায়তা না জানলে মানুষ গুরুকরণের প্রয়োজন বোঝে না। একটি গানে বলা হয়েছে—

আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন পাখি
তুমি কি প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছো
তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি।
আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ সে তো নয় সামান্য
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য
সে যে স্বর ভিন্ন নয়—
স্বর হ'তে হয় দুয়েতে মাখামাখি।
যারে গুরুতত্ত্ব কয় সে যে যুক্তাক্ষর হয়
স্বরবর্ণ জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝায়।
ও যার স্বরেতে ভুল লেগেছে গোল
কি হবে যুক্ত শিখি।

গানটি দেহতত্ত্বের মূল ইঙ্গিতগুলি চমৎকারভাবে নির্দেশ করছে। বর্ণবোধের সূচনায় যেমন স্বরবর্ণ তেমনই দেহযোগের সাধনার প্রথমেই আত্মতত্ত্ব (অর্থাৎ আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে, আমার কি কাজ, আমার পরিণাম কি)। তারপরে পরতত্ত্ব (অর্থাৎ আমার সঙ্গে জগৎ ও জীবনের সম্পর্ক কি, শরীরে আমার কোন্ কোন্ বস্তু, মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি)। স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ হয় না, তেমনই আত্মতত্ত্ব না হলে পরতত্ত্ব হয় না। স্বর আর ব্যঞ্জনবর্ণের মত তারা ঘনিষ্ঠ। এরপরের পর্যায় গুরুতত্ত্ব বা যুক্তাক্ষর। সবের মূলে কিন্তু স্বরবর্ণ বা আত্মতত্ত্ব। তাই বলা হয়েছে যার মূল স্বরেতেই ভুল তার যুক্তাক্ষর শিখে লাভ কি ?

এ থেকে বোঝা গেল দেহতত্ত্বের সাধনা এক ক্রমিক

উত্তরণের পর্যায়ে বাঁধা, তাতে উল্লম্ফন চলে না। তাই গুরু ত্যেজে গৌর-ভজা চলে না। গুরুই সাধনপথের দিশারী। গুরুসঙ্গ সৎসঙ্গ ('সতের সাথে হ'লেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি')। এঁদের বিশ্বাসের বিচিত্র জগতে গুরু অগণন। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু ছাড়াও নিজের শ্বাসও গুরু এবং ভজনসঙ্গিনী নারীকেও (তাকে বলা হয় 'শ্রীরূপ' বা 'রূপ' এবং রূপকে ধ'রেই স্বরূপের বোধ জাগে) গুরু বলা যায়। তাই গানে আছে—

ভজন সাধন করবি রে মন কোন্ রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হও গে।

এবং আল্লা হরি ছেড়ে ভবে ভজ শ্রীগুরুর চরণ।
গুরু ধরো খোদকে চেনো।

সাধারণভাবে মানুষ কিন্তু মায়ার বশীভূত। সে 'ভুলে আত্মতত্ত্ব সংসার লয়ে / কেবল 'আমার' 'আমার' করিছে'। তাকে আত্মস্থ করাই দেহবাদীদের কাজ। তাঁরা পূর্বজন্ম বা পুর্ণজন্মে বিশ্বাসী নন। তাই বলেছেন,

পাবে সব বর্তমানে প্রাপ্তি যাহা এ জীবনে
বিফল সব মরণে।

সেই কারণেই এঁরা কল্পনাবাদী নন, ভাববাদী নন, কেননা বুঝেছেন যে,

যদি কল্পনা ক'রে অরূপীর সে রূপ দেখা যেত
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত—
কত জল্পনা করিত।
মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গড়ে দিত
'যাদু তোর মা' এই বলিত—
শিশু 'আমার মা' বলিয়ে ছবির কোলেতে উঠিত।

বরং উল্টে এঁদের বক্তব্য,

এই দেহ মিথ্যে নয় মন
এই দেহেই আছে আছে রতন।
যে খোঁজে পায় অন্বেষণ
জীয়ন্তে মরে আপন ইচ্ছায়।

অথচ সেই অন্বেষণ না ক'রে, নিজের দেহভাণ্ডকে না দেখে

অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন,

আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা।

এই কারণেই দেহতত্ত্বের গানের একটা পর্যায়কে বলে 'মনঃশিক্ষা গান' আর এক পর্যায়কে বলে 'আখেরি চেতন'। বর্তমান সংকলনে স্পষ্ট দেহকেন্দ্রিক শব্দ ছাড়াও এমন অনেক গান পাঠকরা পাবেন যা মনঃশিক্ষা, গুরু-তত্ত্ব ও আখেরি চেতন পর্যায়ের। সব পর্যায় কটিই দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে একটা সুপরিকল্পিত ছকে বাঁধা ব'লে পাঠককে বুঝে নিতে হবে। গৌরাঙ্গবিষয়ক স্বল্প কয়েকটি পদকে কেউ যেন দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ মনে না করেন। দেহতত্ত্ব-বাদীদের বিশ্বাসে গৌরাঙ্গ কোন অনুমানের দেবতা নন। শরীরের মধ্যেই তাঁকে উপলব্ধি করবার একটা গূঢ় গোপন সাধনতত্ত্ব আছে। তাতে অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ শব্দেরও গোপন ভাষ্য পাওয়া যায়। বিষয়টি সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ জিজ্ঞাসু তাঁদের পড়তে পরামর্শ দেব 'গভীর নির্জন পথে' নামে আমার লেখা বইয়ের 'গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা' অধ্যায়টি।

দেহতত্ত্ব নিয়ে এই গানের সংকলনে এমন দুটি গান সংযোজন করেছি যার বিষয় দারিদ্র্য, দুঃখ আর ক্ষুধার জ্বালা। সতর্ক পাঠক আলাদাভাবে সে দুটি গান খুঁজে নিয়ে পড়বেন ভরসা রাখি। সে গানের পেছনে কোন তত্ত্ব নেই, শুধু এটাই বোঝার যে গীতিকাররা কত দরিদ্র দুঃস্থ সমাজ পরিবেশ থেকে উঠে-আসা। সংকলনভুক্ত যে গীতিকারদের পদের শেষে ভণিতায় গুরুর নাম আছে বুঝতে হবে তাঁরা গুরুবাদী। গুরুর দোহাই দেননি এমন গীতিকারদের দুজন হলেন লালশশী ও বাঁকাচাঁদ, তাঁরা কর্তাভজা। দীনু, নীলু ও সদানন্দ বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ, গুরুবাদী নন। তাঁদের ভণিতায় সম্প্রদায়স্রষ্টা বলরাম হাড়ির (নামান্তরে রামদীন বা হাড়িরাম) কথা আছে। গীতিকারদের মধ্যে বেশির ভাগই অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত, তবে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অতি অগ্রসর।

পুঁথিগতভাবে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন একজন, তিনি ফিকির-চাঁদ। তাঁর আসল নাম কাঙাল হরিনাথ। তাঁকে সবাই সখের বাউল বলতেন। স্বল্পশিক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোঁসাই গোপাল, হাসনরাজা, লালশশী, দুদ্দু শাহ ও জালালুদ্দিন। এ সংকলনে সব দিকের গুরুত্ব বিচারে লালন শাহের সর্বাধিক (মোট পঞ্চাশটি) সংখ্যক গান গৃহীত হয়েছে। মোটকথা এই বইটিকে সব বর্গের লোকায়ত দেহতত্ত্বের গানের একটি নির্ভরযোগ্য সম্পুট ব'লে বিবেচনা করা চলে।

প্রত্যক্ষত দেহবাদী নন এমন একজন গীতিকারের নাম সদানন্দ। অথচ তাঁর পদে মানবদেহ বিষয়ে এমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বর্ণনার কুশলতা আছে যা বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন 'জলের সুঁই আর পবনের সুতো' দিয়ে নাকি মানবদেহ বানানো হয়েছে। কল্পনার এতখানি অ্যাবস্ট্র্যাকশন চমকপ্রদ। হয়ত প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে কবীরের একটি দোঁহা যার সারার্থ হ'লো—গৃহস্থের জীবনে থাকে মাটির ভিত আর পবনের থাম, তাতে পাঁচতন্ত্রের বন্ধন আর গুণ-অবগুণের ছাউনি। গৃহস্থের চিন্তারূপ পিতা, আশারূপ জননী, দুখসুখ দুইভাই। আশা আর তৃষ্ণা তার সজ্জা। মোহরূপ তার জীবনে কুবুদ্ধি ঘরণী। প্রকৃতি তার কুটুম্ব। পাপপুণ্য তার পড়শী।

বলরামীদের গানেও মানবদেহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা নাকি মায়ার ঘর আর তাতে প্রবোধের বেড়া। সদানন্দ মানবদেহকে বলেছেন কল। সেই দেহের স্রষ্টা বলরামকে বলা হয়েছে হাড়িরাম কলমিস্তিরি। তাঁর হেকমতেই (কৌশল) দেহকল চালু থাকে। এবারে কলের বর্ণনা,

> এ কলের দুখান চাক বাঁকা
> উপরে খেলছে দুই পাখা—
> দুজন কলে চৌকি আছে
> দুজন তাই দিচ্ছে পাহারা।

এখানে 'দুখানা চাক বাঁকা' বলতে বুঝতে হবে দুই কণ্ঠাস্থি। দুই পাখা হ'লো হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। কলের চৌকি দিচ্ছে দুই

চোখ, আর তাকে পাহারা দিচ্ছে নাক আর কান। গানে এরপর বলা হচ্ছে,

যেমন জলের ভিতর আগুন
আগুনের ভিতরে সে জল।
কারিগরের গড়া এ কল
কখনও তা হয়নাকো অচল।

আগুন আর জল হ'লো দেহের উষ্ণতা আর শীতলতার পর্যায়ক্রমের রূপক। তার স্বাভাবিক যুগল সঞ্চারে দেহকল সচল থাকে। আর—

এই কলের পাশে চারখানা থাম আছে গো তার
দেখ দেখতে কি বাহার!
থামের ভিতর তিন তার আছে
কারিগর খবর নিচ্ছে তার।

চারখানা থাম মানে দুই হাত আর দুই পা। তিন তার ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ি।

এরপরে বুঝতে হবে এমন কলও কিন্তু স্বয়ংক্রিয় নয়। কেননা তাকে চালাচ্ছেন হাড়িরাম কলমিস্ত্রি নানা প্যাঁচে।

কোন্ প্যাঁচে ওঠায় বসায়
কোন্ প্যাঁচে চলায় বলায়
কোন্ প্যাঁচ কারিগরের হাতে
কখন টিপ দিয়ে বন্ধ করবে কল।

দেহকলের চাবি নিজের হাতে নেই। তা যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইখানেই দেহ নিয়ে ভাবনা আর কান্না।

দেহতত্ত্বের গান যাঁরা লিখেছেন সেই অত্যন্ত দরিদ্র শোষিত মানুষের (শোষণ বিস্তরের—উচ্চবর্ণের ও সামাজিক অর্থনীতির) দেহ ছাড়া আর কীইবা নিজের ছিল? তাঁদের জীবন ছিল অনিশ্চিত, শস্য সম্ভাবনাও অনিশ্চিত, জমি ও বাস্তুও অনিশ্চিত। দেহই ছিল তাঁদের নিজের একতম সম্পদ। তাই দেহের উপমাতেই তাঁরা জীবনকে বুঝেছেন এবং অন্যকে বুঝিয়েছেন। শ্রীঅশোক সেন যেমন বলেছেন যে, 'লোকধর্মে দেহতত্ত্বের প্রাধান্য নিয়ে অনেক আলোচনা একটি বিশিষ্ট

লক্ষণকে সচরাচর গুরুত্ব দেয় না। লোকজীবনের যে অবস্থায় নিঃস্ব দরিদ্রজনের পক্ষে বাইরের কোনো উপকরণের অধিকার নিতান্তই সাধ্যাতীত, সেখানে নিছক দৈহিক সত্তাকে মানুষ বড় ক'রে আঁকড়ে ধরে, তারমধ্যেই জীবনের সব সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চায়। সেরকম মানুষই তো বারবার লোকধর্মের আশ্রয়ে ইহকাল পরকালের অবলম্বন খুঁজেছে।' (বারোমাস, এপ্রিল ১৯৮৭)।

নিম্নবর্গের হতদরিদ্র গ্রামীণ মানুষের বুভুক্ষা, সন্তান সংখ্যার বাহুল্য, অসহায় অস্তিত্ব ও করুণ মৃত্যুর যে নিত্য চলমান রূপ যুগে যুগে দেখে চলেছে সমব্যথী মানুষ, দেহতত্ত্বের গান সেই ক্ষতে যেন শুশ্রূষা আর সান্ত্বনার মত। এ গান তাই যতটা ধর্মসম্পৃক্ত তার চেয়ে অনেক বেশি জীবনস্পর্শী।

তবু দেহতত্ত্বের গানে একটা অন্য মহত্ত্ব আর উত্তরণের চিহ্ন থেকে যায়। তার মধ্যে একটা অন্তঃরুদ্ধ আর্তি লুকিয়ে আছে। 'আমি কোথায় পাবো তারে' যেন একক আততি-ময় অনুসন্ধানের উচ্চারণ। এই নিঃসঙ্গ উপলব্ধি, এই ছিন্নতার বোধ, প্রার্থী আর প্রার্থনীয়ের মধ্যে লক্ষ যোজনের ফাঁক তো ভরবার নয়। অলব্ধ ও অপ্রাপণীয়ের জন্য এই কান্না হয়তো দেহতত্ত্ববাদীদের উপর সুফী প্রভাবজাত। কেননা সুফীরা প্রতীকবিরোধী। আল্লার জন্য তাঁদের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পবিত্র এক বেদনাবোধে। লালন ফকির হয়ত এমনই এক অস্থির শোচনা থেকে গেয়ে উঠেছিলেন—

কারে বলবো আমার মনের বেদনা
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।
যে দুঃখে আমার মন আছে সদা উচাটন
বললে সারে না।

ঘরের পাশের আর্শিনগরের অদেখা পড়শীর মত দেহতত্ত্বের গানের ভুবন অনেকটাই আমাদের অলক্ষিত থেকে যায়।

রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর 741101

সুধীর চক্রবর্তী

সংকলিত গান ও গীতিকার

অনন্তদাস

মন চলো যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে
সেথা ঠাণ্ডা হবি প্রাণ জুড়াবি আনন্দ সমীরণে।
সে বাগানে তিন জন মালি
একজন উড়ে একজন খোট্টা একজন বাঙালী—
বাগান চষে খোঁড়ে নাড়ে চাড়ে গাছ বাড়ে অতি যতনে।
সে বাগানে আছে চৌদিকে বেড়া
আসমানে ঘেরা তার মেলে না গোড়া
সেথায় শিব ব্রহ্মা আছেন যারা প্রবেশ করে সন্ধানে।
সে বাগানে নিত্য ফোটে চার রকমের ফুল
আনন্দে মন মুগ্ধ করে সৌরভে আকুল
হলো আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল হলো ফুলের
সুঘ্রানে।
সে বাগানে ধরে মেওয়া ফল
সে ফল যে খেয়েছে সেই মজেছে হয়েছে পাগল
যার কর্ম সফল জন্ম সফল ফলের মর্ম সেই জানে।
সে বাগানের আছে মধ্যে সরণি
জলপূর্ণরাশি শতদলে বিরাজ করে রাজ হংস-হংসিনী
আমার কোটি জন্মের পিপাসা যায় এক বিন্দু
জল পানে।
অনন্ত তাই ভাবছে বসে অন্তরে
বাগান আছে কোটি জন্মের পথের অন্তরে।
তুই যাবি যদি সকাম নদী পার হবি তুই কেমনে।

□

বল আমার বাবা কোথায় গেল
দেখিতে দেখিতে আমার দিন গত হলো।
শুধাই বৃদ্ধ মাতার কাছে বাবা আমার কোথায় গেছে
মা বলে তোর ঘরের ভিতর ছিল।
সহোদর বলে ভাই হাটে মিলে নাই
ভগ্নী বলে অগ্নি বেশে ঘর করেছে আলো।

বাবার দেহ বাবার মায় বাবার দোহাই দিয়ে বেড়াই
পিতা পুত্রে আলাপ নাই যে ভাল—
ইতিপূর্বে মাতৃগর্ভে দেখা হয়েছিল।
কেউ বলে গেছে এই পথে কেউ বলে গেছে ওই পথে
নানা মুনির নানা মতে কোন পথে বল।
কেউ বলে নেমেছে জলে কেউ বলে তব অনিলে
কেউ বলে অনলে পুড়ে গেল।
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে বাবার খবর সেই পেয়েছে
সত্য করে আমার কাছে বল।
বল বাবার রূপ বর্ণনা নাম রূপ তার ভিন্ন ভিন্ন
অনন্ত কয় বিশেষ চিহ্ন বাবা আমার কাল নয় ধলো।

□

ওরে আমার মন গোয়াল
দুবেলা তুই দুধ যোগাবি ঐ কথাটি আটা আটি
দুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম গাভী তাহার দুধ দুইয়া লবি
কামধেনুর দুধ দুইয়া খাবি যখন চাবি তখন পাবি।
সাধুর সনে যাবি গোঠে আনবি রে দুধ নিষ্কপটে
অসৎ সঙ্গে লাগিলে ছিটে নষ্ট হবে দুধ সব খোয়াবি।
দুধ বাসনে জল ঢাল না সে দুধ আর পার পাবে না
ফুকার দিলে লুকাবে তখনি তার সাজা পাবি।
দুধ থুস না আলগা করে হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে
অপবিত্র পিঁপড়ে খাইলে কত দেখাবি
আর কত তাড়াবি।
গোঁসাই বলে অনন্ত রে ও তোর কাম-বাছুরে দড়া
ছিঁড়ে
কেমন করে বাঁধিবি তারে এক ঘরেতে রইছে গাভী।

তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
সেই তো তোমার গুরু বটে—
সে যে আছে দেহের মাঝে
তারে ভালবাসো অকপটে।
জীব চলে বলে ফিরে
শুধু তো তাহারই জোরে
সুখ দুখ আদি করে
সকলই ঘটায় এই ঘটে।
করিলে তাঁর সাধনা
সকলই যাইবে জানা
হবে না আর আনাগোনা
এ ভব সংসার সংকটে।
সে যেদিনে ছেড়ে যাবে
তোমারে তো শব করিবে
কেনা বেচা ফুরিয়ে যাবে
এত সাধের ভবের হাটে।

□

কথা বললে তোমায় হবে কি বীজ মানে নিজে আল্লাজী
লাল ফুলে হয় জগত মা-খাকী জরদ ফুলে হয় মহম্মদ রসুল
বলিব কত কি।
ছিয়া ফুলে আদম ছবি ছফেদ ফুলে হয় সাঁইজী
চারি ফুলে হয় দুনিয়ার দুর্লভ আমি কানা দেখতে পাই না।
কোন ফুলে কার যোগ রে খ্যাপা ছোট মুখে বড় কথা
ফুল নিয়ে বসে আছি
ও তার গাছ কি বীজ বড় মানে করিয়া দাও দেখি।

আর্জান শাহ

আগে পড়গা ইস্কুলে
প্রথম যে স্বরে অ-এর স্বর যেও না ভুলে।
অ-এতে অন্ধকার ছিল স্বর বেয়ে আলো করিল
একা চন্দ্র টলে গেল পক্ষ গেল মিলে।
বিলায়েতে ইস্কুল আছে স্বর জানো গুরুর কাছে
স্বরেতে মানুষ রয়েছে বেছে নেওগা তুলে।
তারপরেতে তিনে নিত্য মুরশিদচাঁদ সেইখানে বর্ত
অ-এর ঘরে পাবি অর্থ নয়ন যাবে খুলে।
তিনি যখন সখ্য হবে সরকারীতে পাশ পাইবে
আর্জান বলে দেলে ভেবে চাঁদপতি রয় মূলে।

□

আগে মন মানুষ চিনে ধর।
মানুষের মধ্যে মানুষ দিতেছে সাঁতার।
আনন্দমোহিনী ধরা ধরার কাছে যায় অধরা
ধরায় অধর পড়ে ধরা ধরো হয়ে হুঁশিয়ার।
ধরকে ধরে অধরচাঁদে ধরো রে ধরো রে ফাঁদে
মানুষের জন্যে মানুষ কাঁদে
একি আশ্চর্য ব্যাপার।
তারেতে তার লাগাও রে তার তার ধরে টান
মারো তাহার
মানুষে মানুষের কারবার বেহুঁশ টের পাবে না
তার।
পরম পূজনীয় মানুষ মানুষে দেয় মানুষের হুঁশ
চাঁদপতি সে মহাপুরুষ তাইতো আর্জান করল
সার।

□

রূপে কর সেই রূপ পরিচয়
রূপে স্বরূপের আশ্রয়।

দর্পণেরে সামনে ধরে নিজের রূপে নজর করে
তখন দর্পণের রূপ যায় গো সরে
আপন রূপে মোহিত হয়।
কাঁচে পারা মাখাইলে কাঁচ নাম তার
যায় গো চলে
পরিচয় হয় আয়না বলে আয়নায় ধরা পড়ে
তাই।
আর্জানের জ্ঞান পারা-হারা পশুজীবে করা
মিশ্রণ
স্বরূপে রূপ পড়েনি ধরা চাঁদপতি বই জানে নাই।

□

স্বরূপ রূপে দেখো তাকে
স্বরূপে রূপ রূপে স্বরূপ
ভজো এখন গুরু রূপকে।
সাকার বর্জন করিবে আকার ধরে ভজে যাবে
আকার রূপে সেই রূপে পাবে দেখে
বর্তমানে ভজো তাকে।
রূপের গোলা হয় ব্রহ্মাণ্ড অংশ রূপে করে খণ্ড
আকার সংযোগেতে ভাণ্ড মানবরূপ দেখালে জীবকে।
সৃষ্টির উদ্দেশ হরণ পূরণ চাঁদপতি কয়
শোন আর্জান শোন
মানব অবতার জীবের কারণ দীক্ষা শিক্ষা
দিচ্ছে জীবকে।

□

পিরিতে পিরিতে সুরীতি ফিরিতে দেখা হলো পথে
কালা বোবার সাথে।
নাইকো হস্তপদ দেখতে উর্ধ্ব অধঃ
ভাবে গদ গদ উন্মাদ প্রেমেতে।
দেবের দেব আর সাধুর শিরোমণি
চক্ষু কর্ণ তারা কিছু তো রাখে নি
গুণের গুণমণি পিরিতের ধনী
বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝারে।
দুই দেশেতে তারা দুইজন বসত করে
কী প্রকারে দেখা রাস্তার মাঝারে
হস্তান্তরে চুরি হলো বোবার ঘরে

কালার ফাঁপরে হুহুঙ্কার পুবেতে ।
দুই জনার তামাশা আর্জান দেখে বসে
ইশারাতে শিক্ষা বোঝ মন উদ্দেশে
কালা আর বোবা প্রেমেতে রয় মিশে
গুরু উপদেশ পাইবে দেখিতে ।

কাঙালদাস

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্ত হতে ইচ্ছে যার তার শক্ত হতে হয় ।
শক্তি হলে প্রকাশ সেই শক্তিতে প্রবৃত্তি বিনাশ
মান-অসম্মান বলিদান দিয়ে কর রিপু জয় ।
রিপু-জয় হলে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি
অনায়াসে তখন হবে সিদ্ধি
নইলে মন অ আ ই ঈ করতে হয় ।
সিদ্ধি হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ তখন হিংসা আদি
হয় রে বারণ।
বিবেকী যখন হয় রে মন তখন ভক্তির উদয় ।
কাঙাল বলিছে ভক্তি হয় যখন
ওরে ভেদাভেদ থাকে না তখন।
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ।

কমলদাস

পুরুষ নারী দুই জাতি দেখে কেন দেখ না-
দুই জনে খেলা খেলে যুগল-রূপ ভজনা ।
নিজ নামে নিজ আসনে জানিয়া কর সাধনা

পাইবে অমূল্য ধন জেনে লেহ আমার মন
সর্পের মাথার মুক্তা থাকে সর্প তাহা জানে না।
জানিলে তাহারে ভাই কুদশা ঘটিত না।
তেমনি মানুষের মতি রূহুর পর বসতি
পরত রূহুরে সঙ্গে মিলে বিরাজ করে নিরঞ্জন।
কোরানের আয়াতে আছে আলিয়েম সাঁই রাব্বানা
যে দেখেছে বর্তমানে অনুমান সে মানে না।
অধীন কমল দিনকানা দেখে কেন দেখ না
মানব রূপে ভজন করে ফকিরচাঁদের শ্রীচরণ
আমার মন।

কুবির গোঁসাই

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজে পাবিনাকো রত্নধন।
চুপ চুপ চুপ চুপে চাপে হয়ে থাকো সচেতন
আবার দুপ দুপ দুপ জ্ঞানের বাতি
হৃদয়ে জ্বলবে সদক্ষণ।
খোঁজ খোঁজ খোঁজ হৃদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন
আবার বোঝ বোঝ বোঝ বুঝলে হবে সহজ মানুষের
করণ।
ডেঙ ডেঙ ডেঙ ডেঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন
জন
শোন মন মন মন এ মনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ।

□

মানুষের করণ কর
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর।
হরিষষ্ঠী-মনসা-মাকাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
কৃত্তিহীন পাষাণে কেন মাথা ঠুকে মর।
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষভজন ছেড়ে দাও রে বেদ

মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের।
ঘটে পটে দিও না রে মন
পান কর সদা প্রেম সুধা অমূল্যরতন
গোঁসাই চরণ বলে কুবির চরণ যদি চিনতে পার।

□

মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখি রে মন
মানুষে বিশ্বাস কর রে পাবি রে মানুষের দরশন।
মানুষ নিত্য মানুষ সত্য ত্রিবেদ মানুষের গঠন
যেমন পঞ্চ বর্ণ গাভীরে মন দুগ্ধ হয় তার এক বরণ।
মানুষ হয়ে মানুষ মানো মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো মানুষ রতন ধন।
মানুষ মন ছাড়া বেদ বিধি ছাড়া
বিরজা পার তার আসন
সেই মানুষ জীবাত্মা জীবের জীবন।
চারি যুগেতে মানুষ আছে সেই মানুষ মানুষের কাছে
বহুরূপ ধারণ করেছে মানুষ মানুষের কারণ।
আবার তার উপরে মানুষ আছে
মানুষ প্রাপ্তি বস্তুধন—
কর সেই মানুষের অন্বেষণ।
মানুষ সেই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করেন ব্রহ্ম রূঢ়ে
ধড়ে ধড়ে
অসাধ্য হয় তার করণ
জলে স্থলে হৃদ্‌কমলে মানুষ নয় মানুষের বোলে
কুবির বলে ধরো শ্রীচরণ।

□

মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
তবে রতি ফিরবে জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তুধন।
পরমাত্মা পরম-ঈশ্বর
তিনি সর্ব ঘটে স্থিতি বটে বেদ বিধি অন্তর
এবার পরমজ্ঞানে ভাবো তাঁরে
হবে ভাবলে ভাবের উপার্জন।
এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস

এই মানুষ বিনা হবে না কো
সেই সহজ মানুষের করণ।
এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
এই মানুষ ধরে যাবি তরে
গোঁসাই চরণ বলে কুবির শোন।

□

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে
আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপন সুখে কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
হল এক নামেতে কৃষ্ণের প্রকাশ
বাস করে এক আখড়াতে।
ভাই করেছে হিন্দু যবন কুলীন বা কে
হয় না নিরূপণ
হয় কে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াতে—
আবার কে করে কার ফয়দা দরুদ
বাঁচিনেকো ঝগড়াতে।
মান্য হলো কোরান পোরাণ জলকে পানি বলে জানি দুয়ে এক সমান
একের কাঁকড়াতে সত্যনীরে নিরঞ্জন ভেসেছেন আবার শূন্য কুদরতে।
মুসলমানের আল্লাতালা হিন্দুর ব্রহ্মা বিষ্ণু
ভাবে বিভোলা
এক ঘরে খেলা করে পিংজরাতে
খানা দানা পানি একই জানি বিরুদ্ধ হয় ফুকরাতে।
আবার শূন্য বর্ণ বিচার পরমার্থ
মনস্তত্ত্ব অর্থ কর সার
যেমন বুদ্ধি যার হয় সন্তরেতে
কিন্তু এক বিনে কিছু হবে না
ঠিক থাকে এক টেওরাতে।
এক হাওয়া এক আগুন পানি একে একা দিনে লিখা একই রজনী
সব এক জানি নারি ঠাওরাতে।
কুবির বলে একা চরণ ভেবে পড়ে আছি বোঁতড়াতে।

□

হিন্দু আর যবনের করণ বলব এখন কায়
এরা আসল ছেড়ে নকল ধরে ঠিক পাগলের প্রায়।
ছিল নৈরাকার যখন
ভেসে ছিল নিরঞ্জন দেখে চিনতে পারলে না দুইজন।
হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু মনোভীষ্ট
শিব কিঞ্চিৎ ধ্যানে পায়।
কোন কোন মুসলমান ভাই হয়ে বেইমান
খোদাকে ত্যেজে আউলে ভজে
মানে না কোরান।
ত্যেজে আহানবি কি আজগুবি
সাশুবির দরগাতে যায়।
এই পৃথিবী সৃজন ভাই করেছে যে জন
তারে মানে না জন্মকানা হিন্দুদের আচরণ—
করে দেবী পূজা ভূতের বোঝা রাত্রিদিন বয়ে বেড়ায়।
যত আউলে চাষী পীর তারা করেছেন জাহির
মুসলমানে হাজুদ মানে চাটিম কলা ক্ষীর
দেয় খোদার নামে লব ডঙ্কা সালাম করে গাধার পায়।
হিন্দুর অসংখ্য ঠাকুর যেমন পাদাড়ে ভাসুর
নেংটা হয়ে ঘোমটা টানে লজ্জাতে প্রচুর
এরা নিজপতি চেনে না কো উপপতির গুণ গায়।
এই কলমা কালুল্যা সেই আকবতের হেল্যা
মানে নাকো গেল্যা করে এমনি বেলেল্লা
হলো যার নূরে আলম পয়দা
তার কালাম করে না হায়।
এই হিন্দুর হাবা পূজে দেবী আর দেবা
জন্মেছে যা হতে তারে বলে না বাবা
তাই দেখে শুনে চরণ ভেবে কুবির কয় হায় রে হায়।

□

রাম কি রহিম-করিম-কালুল্যা-কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবন দত্তা
এক চাঁদ জগৎ-উজ্জ্বলা।
আছে যার মনে যা সেই ভাবুকতা
হিন্দু কি যবনের বালা।
নিরঞ্জন নিরাকারে ভেসেছেন বিম্বভরে
ব্রহ্মা আর বিষ্ণু তারে চিনিলে না করি হেলা

সেই ষড়মাংস অঙ্গ যেন
কিঞ্চিৎ ধ্যানে জানে ভোলা।
লক্ষ্মী আর দুর্গা কালী ফতেমা তারেই বলি
যার পুত্র হোসেন আলী মদিনায় করে খেলা
আর কার্তিক গণেশ কোলে করে
বসে আছেন মা কমলা।
কেউ বলে কৃষ্ণ রাধা কেউ বলে আল্লা খোদা
থাকে না তেষ্টা ক্ষুধা ঘুচে যায় জঠর জ্বালা।
মনে ভেবে দেখ এক সকলে পরো এক নামের মালা
এক লয়ে ভাগল বাটি এক পানি আছেন মাটি
এক হাওয়া জানো খাঁটি একের কেবল এ কলা।
কুবির বলে করি এক ভাবনা অঙ্গে মাখি চরণ ধুলা।

□

যে যেমন সেই নাম সাধনা করে
হিন্দু আর মুসলমানে যারে মানে ভক্তি অনুসারে
করে ভাবেতে লাভ ভাবে অভাব এসে এ সংসারে।
উত্তম অধম হিন্দু যারা রাধাকৃষ্ণ ভক্ত তারা
গুরু ছত্র ধারামন্ত্র জপে অন্তরে
বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে।
মধ্যবিত্ত যবনেরা পান্ত ভাতে আপনি মরা
পেটের জন্য খেটে সারা হয় পরিবারের তরে
বলে সেবার সময় আল্লা রছুল পেট ভরে ঘুম মারে।
দেখি পঞ্চ পরিবারে বৈষ্ণবীরে শংখ পরে
গৃহীর মত ব্যবহার করে অনেকে ব্যবসায় ফেরে
কভু ভিক্ষার ছলে হরি বলে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে।
ফরাজিরে রেখে দাড়ি ওজু করে ঘড়ি ঘড়ি
নামাজ পড়ার হুড়োহুড়ি যার যেমন ভাব অন্তরে।
পড়ে আল্লা হামদা মামুদ ভয়ে মাথা কুটে মরে।
অদ্বৈত অবধৌত নিতাই দরবেশেরা বলেন তাই
গৌর প্রেমে পেলে না থাই পড়ে মাঝ পাথারে
তারা রস মেরে রস খাঁটি করে রসতত্ত্বে ফেরে।
কেউ ভাবে পীর মানিক মাদার মল্লিকগ্রাস ভক্ত খোদার
কাটা পীর বাঘাতে সোয়ার নাম জারি অনেক দূরে।
তাদের নাম করে খায় ভিক্ষা করে ফকির বাবাজীরে।
দ্বিজ দীক্ষে দুর্গানামে বলে তারা উমে ধুমে
কুলায় কালীয়ে দুর্গমে পড়েছি ভবঘোরে।

বলে চামুন্ডা চন্ডিকা মাতা খেঁচুড়ি খাবিরে।
যে জন আছে হকের পথে সেই মজেছে হকনামাতে
পার হবে সেই পুণ্য স্রোতে যাবে ভেস্তের মাঝারে
নাই তার মনেতে মলা মাটি চলে খাঁটির পরে।
ব্রহ্ম অধিকারী লোকে ব্রহ্ম মন্ত্র উপাসকে
ব্রহ্মময় সকলি দেখে ব্রহ্মান্ড ভান্ডুদরে
দেখে কুলকুন্ডলিনী হৃদিপদ্মের মাঝারে।
দিনের ভাবনা ভাবি একা করি সদা দিনের লেখা
কবে পাবো দীনের দেখা অন্ধকার যাবে দূরে
প্রভু দীননাথের চরণ ভেবে কুবির কয় কাতরে।

□

আবাদ কর চোদ্দপোয়া জমি লয়ে
থাক রে মন খাটো কৃষাণ হয়ে।
দীক্ষে-গুরু বর্তমান হয়ে অধিষ্ঠান
জমির উঠিত পতিত কিছু নাহিরে।
প্রেম ধীবরে তিনি উলুবনে গেছে বীজ ছিটাইয়ে
আমি হলাম হতভোম্বা
জমি হল অজন্মা মন তুমি রে কৃতিকর্মা
কৃষি জন্ম সুমন দিয়ে।
মন রে জোড়ো ধর্ম-হাল প্রবর্তক-ফাল
সাধক-মুড়ায় সিদ্ধ-ইষ লাগাইয়ে।
জোড়ান দিয়ে রিপুর স্কন্ধে
লাঙ্গল জোড়া সাবন্ধে বেয়ে যাও রে প্রেমানন্দে।
অনুরাগ-পাঁচুনি লয়ে
মন রে কর ভক্তি-চাষ উঠাও বিঘ্ন-ঘাস
জমি সমান কর ধৈর্য-মইয়ে।
নেত্র বারি কর সিঞ্চন রূপ রসানে দেহ মার্জন
প্রকাশিবে বীজ কাঞ্চন অঙ্কুর হবে প্রেমোদয়ে।
দেহ হবে সুনির্মল ধরিবে সুফল
কুবির কয় চরণের ধুলা খেয়ে।

□

মানব-তরী বানিয়েছে সেই হদ্দ কারিকর
খুঁজে পাইনে তাকে কোথায় থাকে
আছে কোন মুলুকে বাড়িঘর।
সকল গড়তে পারে গড়ে যে ভাঙ্গিতে পারে সব পারে

বেটা গুণকারী বেটা সূত্রধর।
অসংখ্য কারিকর আছে কেউ পেটে কেউ গটে ছাঁচে
ছকে বুঝে কাজ কর ভাস্কর।
ভালো এই ছুতোর কার পুত্র বটে
এই ভেবে হলাম ভাবান্তর।
কি জানি কি কাষ্ঠ এনে অস্পষ্ট অতি গোপনে
মন-পবনে করিল নির্ভর
গঠিলে নিগুণে শতগুণে টানে ত্রিগুণে ত্রিগুণাধর।
ঊর্ধ্ব ছিল সপ্তসিন্ধু লয়ে তারি এক বিন্দু
দীনবন্ধু সর্বগুণাধর।
গঠিলে চৌদ্দপোয়া নৌকাখানি
বলে মন তার চরণ ধর।

□

জন্ম-হাঁদা নৌকা তার নাইক সাঁদা মারা
জল ঝরে বানে বানে নোনা বানে জীর্ণজরা।
তাতে গাবকালি নাই কালাপাতি
সৃষ্টিধরের গঠন করা।
মানব-তরীর ছিদ্র নটা টিপনে-ফাঁসা মধ্যে ফাটা
হায় রে জল উঠে ফোটা ঘোচে না।
ভুলুক-মারা নায়ের ভগ্ন গুঁড়া
ডালি পড়ো পেরাক-নড়ো তক্তা চেরা।
বাঁকের গোড়ায় চোঁয়ায় পানি ছেঁচে মরি দিন রজনী
হায় রে গুঁজে দেই ছেঁড়া কানি তবু ডোবে ডহরা
জলে যায়রে ভেসে জলুইখসে দেখে হলাম দিশেহারা।
গড়েছিল কাটে কাটে পিলন কেটে পেরাক এঁটে
হায় রে জল উঠে রাস্তা ছুটে চারদিগেতে বয় ধারা।
কুবির চরণ ভেবে বলে তরী ছেঁচতে ছেঁচতে
হলাম সারা।

□

মন হয়েছে লোহারাম হয় না ভালো গঠন তায়
কামারে হার মেনে গেছে আমার হল একি দায়।
তা মেরে পোড়ালে জালে নরম হয় না ডাঙায় তুলে
তার খাঁচর যায় না যে রে মিলয় না দোতা হয়
দোহাতার ঘায়।

মন যেন ইংলিশ পাটি সকলি তার মলা মাটি
পোড়ালে হয় না খাঁটি চটে ফুটে বেরিয়ে যায়—
কেবল পেটাপিটি দুড়ুম শব্দ ছোটে সকল গাঁয় ।
মন লোহার পরশে ঠেকালে সোনা হয় না কোন কালে
ছোঁয় না কেউ পথে থুলে লোক দেখলে লঙ্ঘে যায় ।
হয় লাভের মধ্যে আগড়া কালো গাই বলদে লাঙ্গল বয় ।
মন-লোহা খাচরের গোড়া তা মিলয় না দিলে জোড়া
বিষম পোড়া হায় রে হায় ।
বলে কুবিরচন্দ্র হয়ে ধন্ধ চরণচন্দ্র রেখে মাথায় ।

□

এই ধড়ের বিচার কর রে মন ভাই—
চোদ্দ পোয়ার মাঝে কোথা কোনখানেতে বিরাজে সাঁই ।
ঘরের মধ্যে বা কে বাহিরে থাকে
অধর-চাঁদকে খুঁজে না পাই ।
ধড়ের মাঝে হিন্দু যবন কোনখানে কোন
জগৎ নিরূপণ
কোনখানে ব্রহ্মার আসন সেই কথা তোমারে শুধাই ।
কর বর্ণ বিচার মন রে আমার কোথা উত্তম অধমের ঠাঁই ।
ধড়ের কোথা গয়া কাশী কোনখানেতে বারাণসী
কোন খানেতে পূর্ণমাসী হেরে মনের আশা পুরাই
আছে কোনখানে অযোধ্যাবাসী দিতেছে রাম সীতার দোহাই ।
কোথা দোজক ভেস্তখানা ধড়ের কোনখানে মদিনা
কোনখানে কাফের বেদিনা কোনখানে কারবালা কসাই ।
ধড়ের কোনখানেতে শহীদ হলেন হাসান হোসেন ভাই দুটি ভাই ।
কোনখানে বৈকুণ্ঠপুরী গোলোকনাথ গোলোক বিহারী
কোনখানে গোবর্দ্ধন গিরি
হেরে দুটি নয়ন জুড়াই ।
ধড়ে বৃন্দাবন রয়েছে কোথা
বিরাজ করেন কানাই বলাই ।

ধড়ের কোথা সপ্তসাগর ভাসিছে কোথা মৎস্য মকর
কোনখানেতে সিংহ শূকর ইহার সকল ঠিকানা চাই।
ধড়ের কোন গাছে কোন পক্ষী বসে
কৃষ্ণ গুণ গাইছে সদাই।
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আদি কোনখানে পুলছেরত নদী
কোনখানেতে আল্লাহাদি হবেন সেই আখেরি কাজাই
কুবির বলে আমি চরণ ভেবে অতি সংক্ষেপেতে বুঝাই।

□

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা।
যখন খেই যাবে ছিঁড়ে লব জুড়ে
ফেলব না তার এক ফোঁটা
সদা ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠে রতি আছে আমার মন আঁটা।
ভস্‌কে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে ভয় কি তায় এত
কত শত ঘুচাই জড়পটা।
নাটিয়ে করব পাতা দেখব তা বাধবে না কোন নেটা।
যখন সুতা করব মাতি লাগাব তায় পাতায় পাতায় খৈ-ভিজে মাতি
দুই এক ঘড়ি ছাড়াব জটা—
শেষে কাড়িয়ে তানা গাঁতা সানা সাঁনপেতে
শাড়ির ঘটা।
হয় যদি তায় কানা ঘরে গুটিয়ে লব
শেষে দিব আলগা খেই পুরে
এক নজরে দেখাব সেটা।
শেষে বোয়া গেঁথে নাচলিতে জুড়ে ফেলব তানাটা।
প্রথমে বিশকরম বলে চালিয়ে মাকু আঁকু বাঁকু
করব না ভুলে তায়
ঝাঁপ তুলে ঘা দিব নটা
তবে ঝাপে ঝোপে বুনব কাপড় দিয়ে ওসাবির কাটা।
কলে বলে নলি চালাব ছিঁড়বে না খেই খাব সেদেই
সাঁদ মেরে যাব
খুব দেখাব আমার গুণ যেটা।
কাপড় বুনব কিসে নরাজ ঘিসে রাখব না দশি কাটা।

ভালো কাপড় বুনতে জানি চিরুণকোটা শালেরবোটা
ঢাকাই জামদানী
তার ঢের কানি তা বুঝে দেয় কটা
কুবির চরণ ভেবে বলে এবার এ দফাতে নাই ঘোটা।

□

আমি লিখলাম সব ঠিক দিতে পারলাম না
একচন্দ্র কোটি অংক পদ্ম শঙ্খ বর্ণ অংক চিনলাম না।
হলাম গুণে গেঁথে বরাহ্ পাগল হিসাবের গোল
বুঝলাম না।
অগণনায় বর্ণ লেখা রাধাকৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্ট খোদ আল্লা এক
রছুল এক ধোঁকা মিটল না
আর রাম রহিম কালুল্লা কালা সে নামেতে
ভুললাম না।
সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে নবদ্বীপে গৌররূপে সকল
জাত ছেঁটে
করলেন এক চেটে সে এক মাল্যাম না।
তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও বিশ্বাস
কল্যাম না।
ভেক লয়ে বৈরাগ্য হলাম মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা
গলাতে দিলাম
জাত খোয়ালাম কিছুই হলো না
হলো আমা হতে ভেক অমান্য হিংসে নিন্দে ছাড়লাম
না।
কামার কুমোর তেলী মালী ভেকের পথে একই সাথে
সকলে চলি
মনের কালি তাও ঘুচালাম না।
হলাম কাদের অংশ বংশ সেটা নিকাশ করে
দেখলাম না।
যদি এক পিতা সকলের হত
এক পথে এক সাথে যেত
এক পাতে খেত এক নাম নিত তাও নিলাম না।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বা কে এক বটে কি ভিন্ন বটে
প্রাণ সঁপি কাকে
আপন ঠিকে কাউরে আনলাম না।
কুবির বলে গুরু নিষ্ঠে করে চরণে মন রাখলাম না।

গগন হরকরা

আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে—
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয়শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশী দেখতাম নয়ন ভ'রে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে
মরি হায় হায় রে
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কি দেখিতে পারে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায় হায়রে—
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেল রে তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে—
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন ভেবে মরে
মরি হায় হায় রে—
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস কৃপা করে
আমার সুহৃৎ হয়ে ব্যথার ব্যথিত হয়ে
আমায় বলে দে রে।

গোপালদাস

বাজারে হাতি দেখা হয়েছে—
চার কানায় দেখে এসে
আপন আপন বলতেছে।
একজন বলে 'কই সবার কাছে
হাতি দেখা হয়েছে—
নরম নরম সুপারির গাছ খাড়া রয়েছে।
তার উপর মোটা নিচে সরু
মাথা কুমড়োর মত ঝুলতেছে।'
আর একজন কয় 'তোমার কথা নয়
আমি ঠিক বলি তোমায়—
চার দিকে কাঁথা ঝোলে কুলোখানির প্রায়।
যত অজ্ঞানেতে গল্প করে
তা তো সব দেখি মিছে।'
আর একজন কয় শোনো বিবরণ
'তোমরা যা বলো এখন
একটি কথা নয়কো সাচচা বলো অকারণ
হাতি পাকা ঘরের থাম্বা যেমন
খাড়া হয়ে রয়েছে।'
গেল্লা করে আরেকজনা কয়
'বড় অসইলো তো হয়
দেখলাম হাতি আখ একগাছি
নিচে পাতা রয়।'
গোপাল কয় খেদেতে
চার কানাতে আচ্ছা মজা লাগিয়েছে।

□

হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
গড়েছে তিন কারিগর মিলিয়ে শহর
টানা দিয়ে তিন গুণে।
শুভাশুভ যোগের কালেতে
জীব মায়াগর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে
উলোট্ দল কমল যথা বিশেষ মতেতে।
এই বার সৃষ্টিকর্তা গড়লেন আত্মা
জীবের কর্মসূত্রের ফল জেনে।
প্রথম মাসে মাংস শোণিতময়
দুই মাসে নর নাভী কড়া অস্থি-র উদয়—
তিন মাসে তিন গুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্ম লোম আনে।
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার
পঞ্চতত্ত্ব এসে তবে করলেন সঞ্চার—
সেই দিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয় মাসেতে ষড় রিপু বসিল স্থানে স্থানে।
সপ্তমে সপ্তধাতু যে—
এরা আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে।
নয় মাসেতে নয় দ্বার প্রকাশ
দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।
গোঁসাই কালা বলছেন শোন্‌রে গোপালে
বায়ু কর্তা নেত্র এলো বাহির মহলে—
এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদিছে পড়ে ভূতলে।

□

যার জন্যে বাউল কেন সে কাজেতে হচ্ছে ভুল
নিয়ে জপের মালা আঁচল-ঝোলা মন রে
মিছে দেশ জুড়ে বলা বাউল।
ত্যেজে রত্ন সিংহাসন রূপ-সনাতন ভাই দুজন
করে করোয়াধারণ

হয়ে হাল সে বেহাল দীনের কাঙাল
মন রে তাদের কিসে ছিল অপ্রতুল।
তুমি কেন ঘামাও মাথা গায়েতে ছেঁড়া কাঁথা
ছিলে বা কোথা
দেখি কপনি-আঁটা দীর্ঘ ফোঁটা
মন রে তোমার মুখে দাড়ি লম্বা চুল।
শুনি হরিনাম রসের গাছে
চার ডালে চার ফল আছে কে যায় রে তার কাছে।
শুনি পাতায় পাতায় চন্দ্র গাঁথা মন রে
খোঁজ না কোনখানে তার বৃক্ষের মূল।
তোর গুরু বসে কোন ফলে মৃণালে মৃগ খেলে
সে ফুল ভাসে কোন জলে।
অধীন গোপাল বলে সেই কমলে মন রে
কোন ভ্রমরা বসায় হুল।

গৌর গোঁসাই

বাহারে খবর আসে তারে তারে তারেতে
এ তার নহে সে তার ভাই যে তার মিশে তারেতে।
পূবে মুগুর মারলে তারে পশ্চিমে এসে উত্তর করে
সে কি তারের তার তারে কহ শুধায় তারেতে।

□

এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে
হরি না ভজিলাম অসারে মজিলাম
যাহা বলে এলাম ভবে গেলাম ভুলিয়ে।
নবদ্বীপ হতে যে পুঁজি এনেছিলাম
দেবগ্রামে তোলা দিতে আসলে হারালাম।
আছে বিক্রমপুরের হাট কি দিয়ে করি আর
দিবানিশি তাই আমি মলাম ভাবিয়ে।

ঢাকা হতে আমি করেছিলাম আশা
ভজব হরি বলে কর খোলসা
আছে রংপুরের তামাসা তা দেখে হল নেশা
সেই হতে দুর্দশায় নিল ঘিরিয়ে।
সয়দা বাজারে সয়দা হবে কি
ছয়জনা গাঁট কাটা খেলছে ফাঁকি
সেই ফাঁকিতে হলাম ফাঁকি
আখেরিগঞ্জের বাজার গেল রে বয়ে।
গৌর গোঁসাই কয় শোন রে পাপমতি
স্বভাবকে সলা করে ঘটেছে দুর্গতি
শোন রে অবোধ মন বিনয় বচন
স্বভাব ছেড়ে গুরুর চরণ ধর জড়ায়ে।

□

পাপ না থাকলে পুণ্যির কি মান্য হ'ত
যমের অধিকার উঠে যেত।
যদি দৈত্য দুশমন না থাকত
কাম ক্রোধ না হ'ত
মারামারি খুনখারাপি জঞ্জাল ঘুচিত
সবাই যদি সাধু হ'ত
তবে ফৌজদারি উঠে যেত।
দোষ গুণ দুইয়েতে এক রয়
কর্মক্ষেত্রে পৃথক হয়
পৃথক পৃথক না থাকিলে
দোষ গুণ কেবা কয়।
যদি অমাবস্যা না থাকিত
পূর্ণিমা কে বলিত।
গুরু মূল গাছের গোড়া
আছে ত্রিজগৎ জোড়া
কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম
কোথাও নেই ছাড়া।
লঘু যদি না থাকিত
গুরু কেবা বলিত।

জহর শাহ্

দেখ আবের গাছে ফুল ধরেছে মীন রয়েছে
তার ভিতরে
সে মীন রয় চিরদিন দুরন্ত মীন
মৃত্তিকাহীন সরোবরে।
দেখ সে আজগুবি ফল ডাল ছাড়া ফুল
ফুল ছাড়া ফল সরোবরে
সে ফল বোঁটা-ছাড়া জগৎ-জোড়া উল্টা-দাঁড়া
পূর্ব পারে।
দেখ সে আবের বেহন করে রোপণ সাঁইজী আছে
তার উপরে
সে আবের ধ্বজা করে অংকুর দয়াল ঠাকুর বল যারে।
সে আল্লা নবী আদম ছবি তিন জনে সে গাছে
খেলা করে।
জহর কয় আবের কলা যাবে জ্বালা
সাঁই যদি দয়া করে।

চাঁদ সুদীন

ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ
ঢাকা খুলে দেখলে পরে থাকবে না তোর
সাবেক মন।
ঢাকার কথা শোন তোরে বলি

ঢাকার ভেতর আছে ঢাকা তেপ্পান্ন গলি
তাতে চতুর মানুষ কেউ পড়ে না পড়ে যত অন্ধজন।
ঢাকায় কূপ রয়েছে গোটা আট নয়
আটের কাছে যেমন তেমন একের কাছে ভয়
সেথায় বেহুঁশারে পড়লে পরে তখনি হারাবি জীবন।
ঢাকাতে আছে বহুতর কারবার
মহাজন অনেক আছে ছুটকো দোকানদার
ও কেউ লাভে মূলে হারিয়ে বসে
কেউ লাভ করে অমূল্য ধন।
চাঁদ সুদীন বলে হায় কি করিলাম
ঢাকেশ্বরী না পূজে কেন ঢাকাতে এলাম।
সেথায় কেউ বা দেখছে মণিকোঠা আমি দেখি উলুবন।

গোঁসাই গোপাল

আল্লা হরি কি জাত ছিল
মরি মনোদুঃখে চর্মচোখে তারে দর্শন না হইল।
কেউ বলে মোর আল্লা বড় কেউ বলে মোর হরি বড়
কি দেখে ভজন কর আঁধারে সাপ ধর
দুভাবে পড়ে এক পথ ছেড়ে কে কোথায় ধর্ম করিল।
দেখো সব জিনিসে ঈশ্বর থাকে
ও সে দেয় না দেখা যাকে তাকে
দেশ ছাড়া আছে ফাঁকে কথা বলবো কাকে
দেখো গঙ্গার জল আর পুষ্করিণীর জল
ইহার মধ্যে দ্বৈত বাধিল।
যেমন এক বাপেতে জন্ম হ'লো
আবার এক না ভজে সবে ম'লো
এসব কারে বলবো বল বললে সব বিফল
গোঁসাই গোপাল বলে কর্মফল
এক চিনে আর না ভজিল।

□

আল্লা হরি ছেড়ে ভবে ভজ শ্রীগুরুর চরণ
যাতে এবার পালাবে শমন —
মানুষ গুরু বিনে ভবে না দেখি কোন রতন।
আল্লা হরি অনুমানে রয়
না দেখিলে ভজন কিছু নয়
ডাকলে পরে কথা না কয়
বারণ করলে না শোনে কখন।
আছে এই মানুষে কিরূপ কারখানা
ডুবে না দেখে মন হলি দিনকানা
মানুষ বিশ্বাস হলে যাবে জানা
ও মন সময় থাকতে হও মগন।
মানুষ রূপে খেলছেন আলেক সাঁই
চার যুগ ভরে মানুষ শুনতে পাই
মানুষ ভিন্ন আর কিছু নাই
গোঁসাই গোপাল না করল রূপ নিরূপণ।

□

বিরজার প্রেম নদীতে যে জন ডুবেছে
ও সে অটল মানুষ রতন পেয়েছে।
সাধারণী আর সমঞ্জসা
সমর্থা প্রেম কুটিল বড় নাই তার ভরসা—
ইহার তিন মানুষের করিলে আশা হবে তার নিরাশা
জেনে লও এক মানুষ বসে আছে।
ভাবের মানুষ রয়েছে তিন জন
প্রেমের মানুষ ছয় জন খেলে শুন বিবরণ—
উল্টা কলে যে চলে উজান
জেনো সেই তো আপন রস পাবি তুই তার কাছে।
ত্রিবেণী হয় নাভি-কমলে
তাহার মধ্যে ডুবতে পারলে অধরচাঁদ মেলে—
গোঁসাই রামলাল এসব ভেবে বলে
যেন যাসনে ভুলে গোপাল তোর দেহের মধ্যে
সব আছে।

কোন খানে চন্দ্রের বসতি
কোন পাকে রজনী ঘোরে কোন পাকে হয়
দিনের গতি।
পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ জানে সর্বজন
অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ কে করে তার অন্বেষণ।
চার চন্দ্রের নিরূপণ জানগা মন তার বিবরণ
জানলে পরে জীব দেহেতে ঘুচে যেত কুমতি।
উদয়-অস্ত চন্দ্রের কর্ম জানিবে ভবে
দীপ্ত চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় হইবে তবে—
দুই পক্ষে একটি হয় তার নাম যুগল কয়
আধ চন্দ্র গুপ্ত মেয়ে ব্রহ্মমূলে তার পতি।
অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র যে করে উদয়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তিন ধামেতে হবে জয়
সামান্যের কর্ম নয় সাধিলে সিদ্ধ হয়
এবার গোঁসাই রামলালে বলে
গোপাল দেখতে পাবি তার জ্যোতি।

জালালুদ্দিন

ছিল না আসমান-জমি আগুন-মাটি-হাওয়া-পানি
বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রগ্রন্থ ধর্মবাক্য কোরানখানি।
নির্বিকল্প নিরাকার অখণ্ড সে মণ্ডল-আকার
চঞ্চল প্রভু একা তাঁহার ছিল না কেউ সঙ্গিনী।
'হু'-শব্দে ভাসিয়া পরে স্বরূপেই ধ্যান করে
'হা-হে' শব্দ লইয়া ডিম্বে গোপন হয় রব্বানী।
নীচেতে নূরের জ্যোতি উপরে উঠে মাতৃশক্তি
তাপে ডিম্ব ফুটাইয়া অলঙ্কারে সাজেন তিনি।

'হে'-য়েতে আপনি আহাদ 'হু' শব্দে নূরমোহাম্মদ
'হা'-য়েতে আদম-বুনিয়াদ জালালের বাণী।

□

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে
মানুষ ভজ কোরান খুঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।
খোদার নাহি ছায়া-কায়া স্বরূপে ধরেছে মায়া
রূপে মিশে রূপের ছায়া ফুল কলি হয় প্রেমের গাছে।
আরব দেশে মক্কার ঘর মদিনায় রছুলের কবর
বয়তুল্লায় শূন্যের পাথর মানুষ সব করিয়াছে।
মানুষে করিছে কর্ম কত পাপ কত ধর্ম
বুঝিতে সেই নিগূঢ় মর্ম মন-মহাজন মধ্যে আছে।
দেলের যখন খুলবে কপাট দেখবে তবে প্রেমের হাট
মারিফত সিদ্ধের ঘাট সকলি মানুষের কাছে।
সৃষ্টির আগে পরোয়ারে মানুষেরি রূপ নেহারে
ফেরেশতা যাইতে নারে মানুষ তথায় গিয়াছে।
মানুষের সঙ্গ লইয়া পৃথিবীতে জন্ম লইয়া
খেলতে হইল মানুষ লইয়া
জাত বিনে কি জাতি বাঁচে।
মানুষের ছবি আঁকো পায়ের ধূলি গায়ে মাখো
শরীয়ত সঙ্গে রাখো তত্ত্ব-বিষয় গোপন আছে।
জালালে কয় মন রে পাজি করলে কত বে-লেহাজি
মানুষ তোমার নায়ের মাঝি এক দিন গিয়া হবে
পাছে।

□

ধর্ম কি জাত বিচারে
যোগী ঋষি মহাজনে সবাই দেখে সমান করে।
করিম-রহিম রাধা-কালী এ-বুল সে-বুল যতই বলি
শব্দ-ভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে।
মানব-দেহে থেকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে
প্রেমের মূর্তি লয়ে একজন বিরাজ করে প্রতি ঘরে।

ক্ষিতি-জল-বায়ু-বহ্নি আগুন-মাটি-হাওয়া-পানি
এক ভিন্ন আর নাহি জানি যা-আছে সংসারে।
করিম-কিষণ হরি-হজরত লীলার ছলে ঘুরে
ভাবে ডুবে খুঁজে দেখ ভেদাভেদ কিছু নাই রে।
হিন্দু কিবা মোসলমান শাক্ত বৌদ্ধ খৃশ্চিয়ান
বিধির কাছে সবাই সমান পাপ পুণ্যের বিচারে।
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড সাঁই লক্ষ আকার ধরে—
মাটি দিয়ে কুম্ভকারে পুতুল-পাতিল কতই গড়ে।
জালাল পাগলার কথা ধর আত্ম-সমর্পণ কর
দলাদলির ভাবটি ছাড় বলি বিনয় করে
করো না দু'দিনের বড়াই সং সেজে সংসারে—
এক হাতের তৈয়ারী জীব আসা যাওয়া এক বাজারে।

□

অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে বেড়াই তার তালাসে
শতকে একটা সত্য কথা শুনলে আবার মড়ায় হাসে।
হাঁটি পিছন দিকে চাইয়ে শুকনাতে যাই তরী বাইয়ে
পেট ভরে তিন বেলা খাইয়ে দিনটা কাটাই উপবাসে।
রাজা বাদশা উজির নাজির
সবাই মোর খেদমতে হাজির
জরুলাড়কা মন-বাবাজীর তখ্ত আমার জলে ভাসে।
দালান কোঠায় মানুষ নাই বন-জঙ্গলে গেছে সবাই
পুড়ে যদি হইতাম ছাই উড়ে যাইতাম ঐ-আকাশে।
দুনিয়ার সব আমার গড়া পৃথিবী মোর পেটে ভরা
মরব বলে জেতা মরা গোর খুদতেছি বাতাসে।
জালালে কয় ওরে বেটা তোর মত আর ভাল কেটা
চিনতে লাগে বিষম লেঠা কেবল মাত্র অবিশ্বাসে।

□

আসল নামটি কি হয় তোমার জানতে আমি জিজ্ঞাস
করি
এক বিনে যার দুই মিলে না
সেই শব্দ কই বিশ্ব জুড়ি।

ফলে কিন্তু নাম নাই তোমার
ডাকছে মানুষ নানা প্রকার
তবে তুমি কেটা আবার মিথ্যা নামের ছড়াছড়ি।
নিশ্বাস করে চলাচল নষ্ট করে আয়ুর বল
নিরক্ষর ধ্বনি কেবল সে-কি নামের পড়াপড়ি।
আমাতে তোর কি অধিকার আমি-যে কেবলি আমার
এ ভাব-সে ভাব স্বভাব আমার স্বভাবেরি মরামরি।
আমি গেলেই গেল সকল
জালাল কয় মোর নামটি কেবল
থাকবে বাকী ভুঁই রসাতল ছুটবে যে দিন ধরাধরি।

□

আমি বিনে কেবা তুমি দয়াল সাঁই
যদি আমি নাই থাকি তোমার জায়গা ভবে নাই।
যা করেছ আমায় নিয়ে সৃষ্টিকে সৌন্দর্য দিয়ে
প্রাণে প্রাণে মিশে গিয়ে মহাপ্রাণে করছ ঠাঁই।
বিশ্বপ্রাণের স্বরূপ-ছায়া আমাতে তোমারি মায়া
ছেড়ে দিলে এ সব কায়া তুমি বলতে কিছুই নাই।
তুমি সে অনন্ত অসীম আমাতে হয়েছ সসীম
কালীকৃষ্ণ করিম রহিম কত নামে ডাকছি তাই।
যথায় বাগান তথায় কলি যথা আগুন তথা ছালি
কথায় শুধু ভিন্ন বলি আসলে এক বুঝতে পাই।
মস্ত বড় প্রেম শিখিয়ে তুমি গেছ আমি হয়ে
ভুলের জালে ঘেরাও দিয়ে ঘুম পাড়ায়ে খেলছ লাই।
জালাল কয় সেই ঘুম থেকে
ঘর পোড়া যার স্বপ্ন দেখে
গলা ভাঙছি ডেকে ডেকে শক্তি নাই যে উঠে পালাই।

□

আমার আমার কে কয় কারে ভাবতে গেল চিরকাল
আমি আদি আমি অন্ত আমার নামটি রুহুজ্জামাল
আমারি এশকের তুফান আমার লাগি হয় পেরেশান

আবাদ করলাম   ছারে-জাহান
আবুল-বাশার বিন্দু-জালাল।
আমিময় অনন্ত বিশ্ব—আমি বাতিন আমি দৃশ্য
আমি আমার গুরু শিষ্য ইহকাল কি পরকাল।
আমার লাগি আমি খাড়া আমার স্বভাব হয় অধরা
আমি জিতা আমিই মরা—আমার নাহি তাল বেতাল।
আমি লায়লী আমি মজনু আমার ভাবনায় কাষ্ঠ-তনু
আমি ইউছুফ মুই জোলেখা—
শিরি ফরহাদ কেঁদে বেহাল।
আমি রোমের মৌলানা শাম্‌ছ তব রেজ দেওয়ানা
জুমলে-আলম মোর শাহানা
খাজা সুলতান শাহ্-জালাল।
আমার বান্ধা কারাগারে আমিই বন্ধ অন্ধকারে
মনের কথা বলব কারে কেঁদে কহে দীন জালাল।

□

চিন্‌গে মানুষ ধরে
মানুষ দিয়া মানুষ বানাইয়া সেই মানুষে খেলা করে।
কিসে দেব তার তুলনা কায়া ভিন্ন প্রমাণ হয় না
পশুপক্ষী জীব আদি যত এ সংসারে
দুইটি ভান্ডের পানি দিয়া অণ্ট জিনিষ গড়ে—
তার ভিতরে নিজে গিয়ে আত্মারূপে বিরাজ করে।
মায়া সুতে জাল বুনিয়ে প্রেমের ঘরে ভাব জাগায়ে
প্রাণেতে প্রাণ মিশাইয়ে রহে জগত জুড়ে
নব রঙ্গে ফুল ফুটিলে ভোমর আসে উড়ে
ফুলের মধু দেখতে সাদা আপনি খেয়ে উদর ভরে।
সমুজ নিয়ে দেখ চেয়ে পুরুষ নহে সবেই মেয়ে
থাকবে যদি পুরুষ হয়ে চল ভেদ-বিচারে
একটি পুরুষ নিজ ছুরতে জগত মাঝে ঘুরে—
লক্ষ নারীর মন যোগাইয়া প্রেমের মরা আপনি মরে।

□

মন পাখি তুই তারে ডাকি কেন ভাসো আঁখি জলে
তারে ডাকলে আগুন জ্বলে।

ডাক ছেড়ে দেও ডাকিও না ভাব ছেড়ে দেও ভাবিও না
সাধন ছাড় সাধিও না সাধলে উজান চলে।
যে পথে যাইতে মানা সেই পথেই হও রওয়ানা
নিষেধ-আজ্ঞায় কান দিও না চল উল্টা কলে।
সিদ্ধ পুরুষ ভাবে যারা উল্টা পথেই গেছে তারা
এই তার স্বভাবের ধারা হাসে ভাসাইয়ে অকূলে।
পথে গেলে পন্থ ভুলায় খুঁজিলে সে অমনি পলায়
খুশী থাকে অবাধ্যতায় মান করিলে কোলে তুলে।

□

ম্যারিফত বিচার কর বসিয়ে শরিয়তের কোলে
ষাইট হাজার গোপনের কথা নিষেধ করেছেন রছুলে।
শরিয়তের নামাজ রোজা এবাদতের রাস্তা সোজা
মারফতে আলী মর্তুজা মধু খেয়ে গেছেন ফুলে।
শরিয়তে নাও সাজাইয়া তরিকতে মাল ভরিয়া
হক সাহেবের হাটে গিয়া
দেও মারফতের পাল্লায় তুলে।
হাওয়া মাটি আগুন পানি তাদেরে কি খোদা মানি
দশ দিকেতে টানাটানি পড়ে মস্ত কথার ভুলে।
কানে কানের কথা শুনে সন্দেহ লেগেছে প্রাণে
লেখা কথায় পাই কেমনে কোন কথা রয়েছে মূলে।
লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করলেই বুঝবে সারাসার
জালালে না পেলে কিনার পড়িতেছে বিষম গোলে।

আমি জিজ্ঞাসি হে গুরু ধন
জম্বু দ্বীপে স্থূলের দেশ হইল কি কারণ
আমায় বুঝাইয়া দাও কারে বলে
আলম্বন আর উদ্দীপন।
কাল কেন হয় অনিত্য কলি
পাত্র সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা কেন না বলি
আমি জানবো বলে সেই প্রণালী
করতেছি ঐ নিবেদন।
কও শুনি সেই তত্ত্ব সমুদয়
জীবে আর পরমে কি সম্বন্ধ হয়—
কেবা পিতা কেবা তনয়
হয় কিসে দেহের গঠন।
মহতত্ত্ব কারে বলে
কোথায় ছিলাম কেন বা আইলাম এই ভূমণ্ডলে
দীন শরৎ বলে জানব বইলে
মনে করি আকিঞ্চন।

□

আমি অভাজন ভজন সাধন জানি না
না জানিলাম দেশকালপাত্র হইল না মোর উপাসনা।
স্থূলের তত্ত্ব বল দয়াময়
কিবা কাল কেবা পাত্র কে হইলেন আশ্রয়—
আমি জানব বলে সেই সমুদয় মনে করি বাসনা।
আলম্বন আর কিবা উদ্দীপন
কত বিধা ভক্তি ধর্ম বল গুরুধন
স্থূলের গুরু কোন মহাজন
কোন্ দেবতার হয় সাধনা।
দীন শরৎ বলে মিছা মায়াতে

বিফলে কাটাইলাম কাল স্থূলের দেশেতে—
আমি যাইতে চাইলে সাধন পথে
ফিরায় আমায় এই ছয়জনা।

□

স্থূলের বিবরণ আগে জেনে লও রে মন
স্থূলের মূলে গোল হইলে হবে কি সেই সাধন ভজন
জম্বুদ্বীপ হয় রে স্থূলের দেশ
কাল হইল অনিত্য কাল জেনে লও বিশেষ
পাত্র হইলেন সৃষ্টিকর্তা আশ্রয় পিতামাতার চরণ।
আলম্বন হয় বেদাদির ক্রিয়া
উদ্দীপন পুরাণাদি শ্রবণ করা
ভক্তি হয় চৌষট্টি অঙ্গ অষ্টকর্ম হয় রে করণ।
দীন শরৎ বলে যে দেশেতে যাবে
স্থূল হইতে মূল বস্তু সঙ্গেতে নিবে
প্রবর্তকে দীক্ষাগুরু করে দিবে মন্ত্রচেতন।

□

দেহের তত্ত্ব জানতে আমার মনে আকিঞ্চন
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব কও শুনি হে গুরুধন।
কোথায় আছে রবি শশী বল গুরু তাই প্রকাশি
অমাবস্যা পূর্ণমাসী কোন সময়ে হয় গ্রহণ।
ঐ যে আমার দেহ মাঝে কোন চন্দ্র কোথায় বিরাজে
কোন চন্দ্র আকাশে আছে কোন চন্দ্র পাতাল ভুবন
চারিচন্দ্রের সাধন তত্ত্ব গুরু আমায় বল সত্য
কোন চন্দ্রের কি মাহাত্ম্য জানতে চাই তার মূল কারণ।
দীন শরৎ বলে গ্রহণ কালে
কোন রাহু সেই চন্দ্রে গিলে
কোন চন্দ্র সাধন করিলে জন্ম মরণ হয় বারণ।

□

দেহের তত্ত্ব জানাব তবে আগে যেয়ে গুরুর চরণ ধর
পাবি রে তুই নিত্য দেহ চারিচন্দ্র সাধন কর।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব ঐ
হাতে দশ পায়ে দশ গণ্ডস্থলে দুই

অধরে ললাটে দুইটি অর্ধচন্দ্র তার উপর।
চারিচন্দ্রের জান রে সন্ধান
একটি গরল একটি উন্মাদ রোহিণী আর বাণ
গরলেতে আছে সুধা জেনে লও রে তার খবর।
জেনে লও সেই চন্দ্রের পরিচয়
চন্দ্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডল সহস্রাতে রয়
চন্দ্রবীজে সুধা ঝরে খাইলে মানুষ হয় অমর।
দীন শরৎ বলে শমন রাহুতে
চন্দ্র সূর্য গ্রাস করিবে যে সময়েতে
হবে দুইটি গ্রহণ এক দিনেতে আঁধার হবে দেহ-ঘর।

□

গুরু কও শুনি হে সারাৎসার
কোন কামলায় বানাইছ ঘর এমন চমৎকার।
ঘরের বাহিরেতে জ্বলছে বাতি
ঘরেতে মোর অন্ধকার।
কোন তলায় সেই ঘরের মহাজন
অনুভবে বুঝি মরে আছে আরেকজন
তারে দেখতে পাই না থাকতে নয়ন
আসে যায় কে বারে বার।
দশ ইন্দ্রিয় এই যে রিপু ছয়
কোন মহাজন এই সকলের বিচারকর্তা হয়
আমায় ঘরের তত্ত্ব কও সমুদয় কয়টি কোঠা
কয়টি দ্বার।
কি দিয়ে বানাইছে ঘর খানি
কিসের বা হয় পালা মারইল কিসের কী ছাউনি।
দীন দাস শরৎ বলে শুনি
কোন কোঠায় বসতি কার।

□

বানাইয়া রঙমহল ঘর
ওই ঘরে আছে রে মন তোর ঘরের কারিগর।

ঘরে হাড়ের ঠুনী চামড়ার ছানি
জুইং গাঁথুনী কি সুন্দর।
ঘরে আট কুঠুরী নয় দরজা হয়
আঠার মোকামের মানুষ আঠার জন রয়
ঘরে রবি শশী দুইটি বাতি জ্বলতেছে মন নিরন্তর।
দ্বারে দ্বারে আছে প্রহরী
আদালত ফৌজদারি কোর্ট সদর কাছারি
প্রধান কর্মচারী জ্ঞান চৌধুরী
বিচারের ভার তার উপর।
বায়ু ভরে ঘরখানি খাড়া
আসে যায় ভোর ঘরের মানুষ যায় না রে ধরা—
সেতো বাহিরে ভিতরে ফিরে মন্ত্র বলে দুই অক্ষর।
দীন শরৎ বলে শুন রে অজ্ঞান মন
দ্বারে কপাট দিয়ে তারে কর রে অন্বেষণ
যদি ধরতে পার সেই মহাজন অমরত্ব হবে তোর।

❑

এমন উল্টা দেশ গো গুরু কোন জায়গায় আছে
উর্ধ্বপদে হেণ্টমুণ্ডে সে দেশে লোক বাস করতেছে।
সে দেশের যত নদনদী
উর্ধ্বদিকে জলস্রোতে বহে নিরবধি
আবার নদীর নিচে আকাশ বায়ু
তাতে মানুষ বাস করতেছে।
মন রে সেই দেশে যত লোকের বাস
মুখে আহার করে না কেউ নাকের নাই নিঃশ্বাস
তারা মলমূত্র ত্যাগ করে না
আবার আহার করে বাঁচতেছে।
মন রে দীন শরৎ বলে হইলাম চমৎকার
চন্দ্র সূর্যের গতি নাই ঘোর অন্ধকার
আবার সেই দেশের লোক অবিরত
এই দেশে আসতেছে।

❑

সেই দেশের কথা রে মন ভুইলে গিয়েছ

ঊর্ধ্বপদে হেঁট মুণ্ডে যে দেশেতে বাস করেছ।
বিন্দুরূপে পিতার মস্তকে ছিলে
কামবশে মাতৃ গর্ভে প্রবেশিলে
শুক্র আর শোণিতে মিশে বর্তুলাকার ধরেছ।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমেতে
পঞ্চ মাসে পঞ্চ প্রাণ ভৌতিক দেহেতে
সপ্তম মাসে গুরুর কাছে মহামন্ত্র লাভ করেছ।
তখন চন্দ্র সূর্য না ছিল প্রকাশ
অন্ধকারে জলের নীচে ছিলে দশ মাস
ছিল নাভিপদ্মে মাতৃনাড়ি তাই দিয়ে আহার করেছ।
দীন শরৎ বলে সাধনার ফলে
গর্ভঘোর কারাগার হইতে এই দেশে এলে
মিছে মায়ায় ভুইলে রইলে যাবার উপায় কি করেছ।

দীনু

জানলাম ধন্য নাম কারিগর
ঘরের ছাঁটনি ছেঁটে বাঁধন এঁটে
রেখেছে নবদ্বার।
কারিগরের কি খোদকারি গড়াচ্ছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদানের বলিহারি কিবা কারিকুরি।
ঘরের ফেলে ধোকাকাটি চার চিজে চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি কি চমৎকার।
ধন্য বলি কারিগরে ঘর বাঁধে ঘরের ভিতরে
ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচর।
গিয়ে অন্তঃপুরে ঘর বাঁধলেন ভবের হাটে
আন্‌খা সাজ কেটে নেপলেন চালে

পাটে কি তারিপ তার।
চার খুঁটির উপরে আড়া মায়ার ঘর প্রবোধের বেড়া
স্থানে স্থানে দিয়ে জোড়া রেখেছেন ঘর খাড়া।
ঘরে কত মহামায়া চাল দিয়ে ঘর ছাওয়া
দীর্ঘে চোদ্দ পোয়া কি খাসা ঘর।
গড়ালেন ঘর আন্‌খা সাজে চেনা ভার সেই দ্বিজরাজে
ভুলে রইলাম বিষয় কাজে পড়ে ভবের মাঝে—
ভেবে দীনু বলে আমি না চিনিলাম ঘরামি।

ত্রিজগতের স্বামী গড়নদার।
বল্‌ বিনে কি চলেরে মানব গাড়ী
বল্‌হীন সব অচল হবে চলবে না
বল্‌ থাকিলে চলে দ্রুত   বল্‌ গেলে বুদ্ধি-হত
পরমার্থ তত্ত্ব জেনে বুঝ না।
আর বলের সঙ্গে চলে রিপু ছয় জনা
গাড়ী চলে বলে পরিপাটি রোখ পাড়া রয়েছে মাটি
সতত হাওয়া বহিছে খাঁটি নাসিকায় ধীরে ধীরে।
গাড়ী করে বলে চলে অতি চমৎকার
নব গুণ তার নবদ্বারে
মালেকান তার মালের ঘরে তিন তারেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
মহেশ্বর
সকলের উপরে নিত্য কারিকর গাড়ীর কাল উপস্থিত
হ'লে পড়ে।
খবর চলে তিন তারে আগুন পানি কলের ঘরে
নীচে তার বয় বারি।
গাড়ির কলের ঘরে বলের কত কারখানা সৃষ্টি করলেন
সৃষ্টিকর্তা
বসাইলেন মহা আত্মা জগৎকর্তা কি যোগেতে গঠেছে।
গাড়ীর হস্তপদ চাকা আদি দিয়েছে গাড়ী ঠিকঠাক
গড়েছে ঠিকে
রংখিলে সেরেছে লিখে চলেছে সুখে বলছে সুখে
হাড়িরাম নাম ঘড়ি ঘড়ি।

গাড়ির ষড়দল পদ্মেতে যখন হয় স্থিতি নি-আকারে
নিরাকারে গড়েন নিত্য কারিকরে অন্ধকারে করেন
গাড়ীর আকৃতি
আর দশমাস দশদিন কূপ শহরে বসতি।
দেখ বল্ যদি মা নাহি ধরে সে বোঝা কি বইতে পারে
দীনু দেখে তারিফ করে বলের যায় বলিহারী।

দুদ্দু শাহ

বাপের পুকুর যারে কয়
জন্ম মৃত্যুর কারণ সে হয়।
এ দ্বারে অমৃত নিধি
কেহ কেহ করে সিদ্ধি
আবার পরান বাঁধি নরকে যায়।
ভাব প্রেম কাম শৃঙ্গার
জগতে রয়েছে প্রচার
ঘটে যাহার মনের বিকার সেই তো পায়।
যাতে জন্ম তাতেই মৃত্যু
কালজয়ী চিরসত্য
এ জগতে ইহাই নিত্য দুদ্দু ভাবে জানায়।
একবার হারালে জনম আর পাবে না
যত বলো পুনর্জন্ম তাতে তো পরাণ ভরে না।
দুঃখ ক্ষোভ মনের ধোঁকায়
পুনর্জন্ম সৃষ্টি হয়
তাহাতে পড়েরে সবায় খাবি খায় রে দেখ না।
জনম দুর্লভ অতি ভাই
এমন জনম আর কি পাই
পুনর্জন্ম কেবলি বৃথাই করো না খাতায় দেনা।

এ জনম দুর্লভ জেনে
ধর মানুষের চরণে
বিনয় করে দুদ্দু ভনে কে দেবে তার ঠিকানা।

□

শক্তি ধরে সিদ্ধ কর জীবন সাধন
জানবি এই মানবদেহ কি বস্তুধন
করো না বাক্যে হেলা
অযথা যাবে বেলা
না খেয়ে শুনা কথা
সেধে নাও এখন।
পাবে সব বর্তমানে
প্রাপ্তি যাহা এ জীবনে
বিফল সব মরণে
ভেবে দেখরে মন
দেহকে সত্য জেনো
সাঁইজীর আইন শোন
দুদ্দু বলে তার করণ
লালন শাহ্-র বচন।

আত্মরতি খন্ড করে শরীক হয়
পুত্র কন্যারূপে পুনর্জন্ম তারে কয়।
পুত্র কন্যার মধ্যে সেথা
থাকে বেঁচে পিতামাতা
এই রূপে সৃষ্টির প্রথা চলিয়া যায়।
শুক্র বিন্দু রক্ত রস ধরে
বংশ পরম্পরা চলে ফেরে
এই রূপে তারা জন্মে জন্মে আসে লতাসাধনায়।
ত্রিবিধ যাতনারে ভাই
সেই যাতনায় মরে সবাই
না মরিলে মুক্তি তো নাই জানে তা সবায়।
জন্মিয়া যাতনা প্রাপ্তি
এ কারণে পরম মুক্তি

পাইবে সাধনে শক্তি দীন দুদ্দু কয়।

□

কাগজে চিনি শব্দ লেখা যায়
সেই কাগজ চাটিলে কি মুখ মিষ্ট হয়।
তেমনি শাস্ত্রে লিখা ঈশ্বর
রাত্র দিন পড়ে বেশুমার
পায় কেবা তার দিদার বলো আমায়।
খোঁজো চিনির মহাজন
পলকে পাবে দরশন
সত্য সাঁই আলেক নিরঞ্জন সেই জায়গায়।
অযথা শাস্ত্র বয়ে
গেলি রে বৈদিক হয়ে
দীন দুদ্দু ব'লে ক'য়ে বিদায় নেয়।

□

ভুলো না বৈদিগের গাঁজার ধোঁয়ায়
গাঁজাতে দুকূল যাবে মনুরায়।
আগে গুরু নিষ্ঠা করো
অমৃতধন পেতে পারো
তাইতে শ্রীগুরু ধরো
সকলের বড়ো সেই হয়।
এই দেহ মিথ্যে নয় মন
এই দেহেই আছে আছে রতন
যে খোঁজে পায় অন্বেষণ
জীয়ন্তে মরে আত্ম ইচ্ছায়।
প্রাচীন নূতন দুই পথ ভাই
সাধন-দ্বারে দেখতে পাই
লালন সাঁই বলেন সর্বদাই
দুদ্দু মোর চলিস সদায়।

□

মানুষ রতন চিনলে না রে ভাই
গেলে পুতুল পূজে জনম গো ভাই।

যে ভাস্করে গড়ে পুতুল
তার চরণ করিয়া ভুল
পুজে সকলে মাটির পুতুল দেখিরে তাই।
চিনলি না রে বাংকি সোনা
কিনলি রে মন পেতল দানা
ভবিষ্যতে যাবে জানা দেখিতে পাই।
সমঝে করো বেচা কেনা
এমন জনম আর পাবে না
দীন হীন দুদ্দুর বর্ণনা যাই রে গাই।

□

সত্য বলে জেনে নাও এই মানুষ লীলা
ছেড়ে দাও নেংটি পরে হরি হরি বলা।
মানুষের লীলা সব ঠাঁই
এ জগতে তুলনা নাই
প্রমাণ আছে সর্বদাই যে করে সেই খেলা।
শাস্ত্র তীর্থ ধর্ম আদি
সকলের মূল মানুষ নিধি
তার উপরে নাইরে বিধি ভজন পূজন জপমালা।
মানুষ ভজনের উপায়
দীনের অধীন দুদ্দু গায়
দিয়ে দরবেশ লালন সাঁইর দায় সাঙ্গ করিয়ে পালা।

□

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
আত্মা কোন অলৌকিক কিছু নয়।
বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে
আত্মার বিকাশ হয়ে
জীবন রূপ সে পেয়ে জীবেতে রয়।
অসীম শকতি তার
যে তাহার করে সমাচার
সাধিয়া ভবের কারবার বস্তুতে হয় লয়।
অন্ধ গোঁড়ামির বিকারে
শূন্যেতে ভরলি ঘট রে
দুদ্দু কয় সে আপন ধান্দায় এখনো ঘুরে বেড়ায়।

□

আমি মনের দোষে হলাম সাধনহীন
পূর্ব স্বভাব যায় না মনের স্বভাব রলো প্রবীণ।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ মৈথুন পূর্বস্বভাব হয় উদ্দীপন
নিজ ইন্দ্রিয় সুখ নিরূপণ মনে তাই হল না সাধন।
প্রকৃতির ভাব পুরুষ লবে পূর্ব স্বভাব ঘুচে যাবে
গোপীভাবাশ্রিত হবে সে ভাবের মন ভাবালি যখন।
সাধনের বল শুদ্ধভক্তি ভক্তিমাত্র হন প্রকৃতি
যাতে উদয় মধুর রতি সে রতির হল না সাধন।
পদ্মে মধু হয় নিরূপণ সে পদ্মে করলে না যতন
দুদ্দু কয় পদ্মপীড়ন করলি না মন তাই হয়ে কঠিন

কারে জানাই গো তার ভাবের কথা
যে ভাব জানিতে গৌর মুড়ায় মাথা।
জানিতে শক্তি তত্ত্ব
সদাশিব হলো মত্ত
জানিয়া পরমার্থ
পেলো অমরত্বের খাতা।
দুরন্ত কাপালিক যিনি
শক্তি সাধেন তিনি
পৈশাচিক তন্ত্র শুনি
গুরুর ধারতা।
সেই শক্তি ত্যজে যারা
স্বকামী শয়তান তারা
শক্তি বিনে সব হারা
দুদ্দু গাধা।

□

সাধন করো রে মন
ধরে মেয়ের চরণ।
যারে ধরে ভবে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি

ফিরিবি অলিগলি
ভুলিয়া এখন।
পিতা শুদ্ধ বীর্যদাতা
পালন ধারণ কর্ত্রী মাতা
সে বিনে মিছে কথা
ভজন-সাধন।
আগে মেয়ে রাজী হবে
ভজনের রাহা পাবে
কেশ ধরে পাড়ে নেবে
দুদ্দুর বচন।

□

জ্যান্তে কালী ঘরের মাঝে দেখলি না
পুতুল পুজে মলি হারে দিন কানা।
জ্যান্তে তারে না চিনিয়া
খড়ের বুন্দেয় ধর্না দিয়া
কি পেলি বল রে ভায়া বল সোনা।
এমন মূর্খ হিন্দু জাতি
না জেনে কোথায় প্রকৃতি
পুতুল পুজে দিবা রাতি মরে দেখ না।
যে শক্তিতে সৃজন সংসার
তারে কেউ চিনলে না এবার
দুদ্দু বলে জগত মাঝার কিরূপ কারখানা।

□

নারী ভজনের গোড়া তন্ত্রের নিরাপন
যুবতী দর্শন মাঝে
কালিকা দর্শনং ভবেৎ
শিবের বচন।
দুষে সেই পরম শক্তি
কোথা গিয়ে পাবে মুক্তি
পলকে ঘটে সিদ্ধি

সেধে যে চরণ।
মনগড়া আইন ঢঁড়ে
বনে বনে বেড়াও ঘুরে
হাতের কাছে মিলতে পারে
পরম রতন।
জেনে শুনে ভজো নারী
হয়ে যাবে নির্বিকারী
দীন দুদ্দু কয় ফকিরি
লালন সাঁইর বচন।

□

কোন কৃষ্ণ হয় জগৎপতি
মথুরার কৃষ্ণ নয় সে সে কৃষ্ণ হয় প্রকৃতি।
জীব দেহে শুক্ররূপে
এ ব্রহ্মাণ্ড আছে ব্যেপে
কৃষ্ণ তারে কয় পুরুষ যেই হয় সেই রাধার গতি।
কৃষ্ণবস্তু নিগম ঘরে
জীবদেহে বিরাজ করে
রসিকের করণ সে কৃষ্ণ ধারণ করণ গম্ভীর অতি।
আত্মতত্ত্ব জানে যে জন
কৃষ্ণ-সেতু চেনে সে জন।
লালন সাঁইর বাণী রসিক ধনী বলে দুদ্দুর প্রতি।

□

চার যুগের উপর কে দেয় খেয়া
তাহারে চিনিয়া ধরো ও মন ভায়া।
শুক্রবিন্দু হয়ে যখন
করেছিলে যোনিভ্রমণ
কে তোমায় করিল ধারণ দয়াল হইয়া।
তোমার মত কত জন রে
বিনা যোগে গেছে মরে
কৃপা করে তোমায় ধরে রাখে জীবন দিয়া।
সেইজন ভজনের গোড়া

হোস্ নে তার চরণ ছাড়া
দুদ্দু কয় মোর মন বেয়াড়া বেড়ায় তীর্থে হাঁটিয়া।

□

সাধকের স্নান নবদ্বীপে হয়
যোগমধ্যে যোগ সেই মহাযোগ
দিব্যযোগ তারে বলা যায়।
নবদ্বীপে জোয়ার এসে
তিন ধারায় তিন মানুষ মেশে
সে মানুষ পাবার আশে
গৌর প্রকৃতির ডাক লয়।
নবদ্বীপে সাধক বিচক্ষণ
হেতুশূন্য মানুষের করণ
টলাটল ছাড়িয়া সাধন
অধরে অধর মিশায়।
নায়ক নায়িকা দুইজন
কর্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাধন
নীরে ক্ষীরে সেধে নেয়।
যে সাধনে নিত্যধাম পায়
সেই পড়ে শ্রীরূপের খাতায়
লালন সাঁই কয় সে সাধ্য নয়
মিছে দুদ্দু গোল বাধায়।

□

জাতি ধর্মের বড়াই করো না ভাই
কত শত মহাপুরুষ তাদের কুলের ঠিকানা তো নাই
নারী নর দুই রূপে মানুষ
আছে তাহার মান ও হুঁশ
খোদার নিচে ভুবন মাঝে শাস্ত্রে শুনি তাই।
ধলা কালার একই বীজ ভাই
সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই।
দীন দুদ্দু বিনয় করে কয়

আমার কোন জাতিগোত্র নাই
দিয়ে মানুষের দোহাই মানুষের বন্দনা গাই।

□

ছোট বলে ত্যাজ্য কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে এলেন ব্রজের কানাই।
শূদ্র চাঁড়াল বাগদী বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন দেখছি রে তাই।
ছোট হীন বলে যারে
ঘৃণা করে দিলে দূরে
আজি সে বসবে উপরে দেখিতে তাই পাই।
এলো রে ধর্ম কলিকাল
ছোট বড় এক হবে সকল
সেই আশাতে ফেলছি নয়ন জল দুদ্দু সর্বদাই।

□

কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
মানুষের চরণ না চিনিলে উপায় নাই।
কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন
ধ্যানধারণা ভজনপূজন মানুষনিধি সর্ব ঠাঁই।
মানুষের আকার ধরে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে
যবন কাফের বলে কারে দিলে গো তাড়াই।
দেখিয়া মানুষের দশা
দুদ্দুর মুখে নাই গো ভাষা
মনেতে করিগো আশা একদিন জানবে সবাই।

□

অজ্ঞ মানুষে জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে।
শিয়াল কুকুর পশু যারা
একজাতি একগোত্র তারা

মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।
নমঃশুদ্র মুচি বাগদী
তারাও খোঁজে জাতির সিন্ধি
হায় রে সুখের বুন্ধি হায় রে ভেয়ে।
জাতি গোত্রের আমরা বাসা
ভবিষ্যতে হবে জাতির দুর্দশা
লালন সাঁই দরবেশের ভাষা দুদ্দু যায় ক'য়ে।

□

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল।
পূর্ব পুনঃ জন্ম না মানে
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে হয় রে কবুল।
বেদ তুলসী মালা টেপা
এসব তারা বলে ধোঁকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা সব করে ভুল।
মানুষে সকল মেলে
দেখে শুনে বাউল বলে
দীন দুদ্দু কি বলে লালন সাঁইজীর কুল।

□

নিরিখ বাঁধো দুটি নয়নে
দেখা হবেই হবে জীবনে।
মিথ্যা নয় সত্য বলি
যে পথে আমরা চলি
বৈরাগী পথ যারে বলি
ত্যাজ্য করো জেনে।
অনুষ্ঠানে মালা জপা
ছাড়ো রে এ সব ভাবা
গাঁজা খেয়ে হাজরা খ্যাপা
কভু হয়ো না কোনখানে।
হিন্দুদের ঠোকাঠুকি

মুসলমানের যত মেকি
দুদ্দু কয় ছাড়ো দেখি
সকলি জেনে শুনে।

□

কলি বলে কেন কলিকালকে দোষা হয়
জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যত্ব উপজয়।
সে কালে আদমগণ
জানতো না কোথায় কোন জন
তাইতে তো এতো ‘অমিলন’ ধর্ম শাস্ত্র সমাজ হয়।
কোন দেশে কাহার বাস
কোথা ধর্ম কোথায় প্রকাশ
একালে জেনে এসব মানুষ জাতি জ্ঞান বুদ্ধি পায়।
বেদ বাইবেল কোরান ত্রিপিটক
গ্রন্থ সাহেব কনফুসির মত
দুদ্দু বলে জানে তো এসব একালের সকল জনায়।

নীলু

আজব কলে বানিয়েছে তরী
গড়নদার হাড়ি রামদীন মিস্ত্রী।
শোণিত শুক্রের তরীর গঠন
চার চিজে চার তক্তা দিয়ে করলে পাটাতন
তরী পবন ভরে আপনি চলে
কিবা তার কারিকুরি।
মানব তরী মাস্তুলের গোড়া
বানের উপর বান দিয়েছে সহস্র জোড়া
কপিকলে কল ঝুলায়ে টানছে তিনজন গুণারী।
মানবতরী চাম দিয়ে ছাওয়া
আড়ে দীঘে চোদ্দ পোয়া তার ভিতরে হাওয়া

ভেবে নীলু বলে হালমাচালে
আছেন রামদীন কান্ডারী।

পদ্মলোচন

ভাঙা ঘরে টিঁকবে কি রে রসের মানুষ আর
আমার ঘর হয়েছে অনাচার।
দৈবমায়া ঘটে যার সনে
নারিকেলের জল কোথা আসে যায় কে বা তা জানে
যেমন গুটি পোকায় গুটি বাঁধে রে
আপনার মরণ করে সার।
ছ'টি ইঁদুর কাটুর-কুটুর কাটছে আমার ঘর
ও তার চৌদিকে হাওয়া ঢুকে আলগা নয় দুয়ার
তীর ধরে নীর ছেঁচতে গেলে
ঝরনা বেয়ে হয় পাথার।
সঙ্গে একটা বিষম সাপিনী
মনের সাধে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কাল ফণী
তার নিঃশ্বাসে বয় বিষের ধোঁয়া রে
সে আমায় খায় কি রাখে ভাবছি আর।
গোঁসাই হরি বলে ও পোদো নচ্ছার
মুলে চুরি করলি রে গোঁয়ার
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী
আমার তাগা বাঁধা হ'লো সার।

□

রসের মানুষ খেলা করে বিরজা-পারে
তার করণ উল্টা স্বরূপ রূপের ছটা
আছে করণ-আঁটা অতি নির্বিকারে।

আটে আটে চৌষট্টি কুঠুরি ভিতরে
রসের মানুষ সেথা নিত্য লীলা করে
তিন দ্বারে কবাট মেরে প্রভু যান তো বাহিরে
কভু সিংহদ্বারে কভু সিন্ধুনীরে।
বারুদ-কুঠুরি ঘর বেদের অগোচর
তাহে অনল-চাপা এই নিট খবর
সেখানকার মহিমা দিতে নারি সীমা
জানে রসিক জনা আস্বাদ ক'রে।
স্বচৈতন্য মানুষ বটে গরল-মাখা
স্বভাব কিন্তু বাঁকা অহিরেব রেখা
তার রসের ঘরে বাতি জ্বলছে দিবা রাতি
অখন্ড পিরিতি আনন্দবাজারে।
তিন প্রভুর মর্ম ছয় গোস্বামীর ধর্ম
নব রসিক যারা করে এই কর্ম
গোঁসাই হরি এমনি ধারা নাহি মৃত্যু-জরা
পোদো এবার পড়লি ভবঘোরে।

ভাবছ কি মন বসে বসে
অনুরাগ নইলে কি গৌরচাঁদ আসে—
চাষ করেছ পরশমণি ফসলে রতন রাখবি কিসে।
আসলে তুই বে বনেদী আশা-দেহে শুষ্ক নদী
তাতে ছয় জনা বাদী বেদ মতে ভেদ নাই
সবাই বলে টিক ধ'রে নীর নিলে শুষে।
আজন্ম কাল ঝাঁট পড়ল না
চাম-চটা এগার জনা তারা করেছে থানা
ঠাঠ-করা তালপাতার কুঁড়ে
কুঁড়ে রইলো বুজে পাঁশে তুষে।
গোঁসাই হরি কয় বারংবার
ও তোর নান্দায় গুড় নাই ভোঁ ভোঁ সার
এসে করলি কি এবার—
পোদোর মন্দিরেতে নাই রে মাধব
শাঁখ ফুঁকে গোল করলি শেষে।

গোঁসাই, হই নাই তোমার তুমি আমার হবে কেনে
আমার মরমের ভক্তি নাই কোন শক্তি
সিদ্ধান্ত উক্তি করি অভ্যাসের গুণে।
থাকতাম যদি তোমার হ'য়ে
পূর্বশৈলে কৃপা-ভানু উঠত তবে প্রকাশ হয়ে
ও তা হবে কেন কপাল মন্দ ঘিরে নিল তমঃ-অন্ধ
হ'ল কন্দর্পের রাজ আপন ইন্দ্রিয়-ইচ্ছা কাজ
তাইতে পড়ে গেলাম আত্মনিবেদনে।
ভাঙা গাঁয়ের তালুকদারি
করতে নারলাম মাল-গুজারি
হবে যখন হিসাব-আখেরী
আমার পূর্বধন যা ছিল ঘরে কাল নিল হ'রে
গোঁসাই এ নয় হীনের ধর্ম করলাম পিতৃদ্রোহী কর্ম
তাইতে পড়ে গেলাম পিতার বিষ-নয়নে।
গোঁসাই হরি পোদোয় বলে সিংহের দুগ্ধ শাণে খেলে
যার যা স্বভাব যায় না ম'লে
পোদোর ঘটল না সে দশা ভাঙলো আশার বাসা
তাইতে যেতে হ'ল চৌরাশী ভ্রমণে।

পাগলা কানাই

পাগলা কানাই বলছে রে ভাই এমন ঘরে বসত করি
ও আমি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই
পাইলাম না ঘরামী।
যদি ঘরামী পাইতাম সারিয়া নিতাম যত বেশী কম-ই
ঘরের উঁচা দোপা কোণাকুণি।
ঘরের মধ্যে চব্বিশ বাতি সদরওয়ালার খেলা

যেদিন উত্তর হইতে আসবে সাপট মারবে ভীষণ ঠেলা
সে সাধের ঘর পড়িয়া রবে কেবল ধরার খেলা
সেদিন বন্ধ হবে সদরওয়ালা।
ঘরের মধ্যে অকূল নদী দেখে ছাতি ফাটে
ওরে চার মুড়ায় চার জন জপ করতেছে
সেই না নদীর ঘাটে
ওরে মুরশিদের মুখের কথা শুনে প্রাণ
চমকে চমকে ওঠে
ও আমার ঘরে যখন তুফান ওঠে।

□

আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি
বাঁধলে নদীর বাঁধ মানে না
আমার এই দেহ-নদী।
যখন নদী বোঝাই ছিল
ঝড় তুফানের ভয় ছিল না গো
নদীর জল শুকাইল চর পড়িল
তবু নদীর বেগ গেল না
আমার এই দেহ-নদী।
পাগলা কানাই বলছে দেহ মাঝে মালেক সাঁই
ও নদীর চার রঙের আসে পানি
কোন জায়গায় তার সাক্ষাৎ হায় রে
আমার এই দেহ-নদী।

□

কি মজার ফুল ফুটেছে এই রঙের মাঝার
দেখতে চমৎকার ভাসছে রে ফুল নিরাকার।
মূল রয়েছে তদন্তরে নবীর দৃষ্টি কার
লগ্ন যোগে লিখা কোষ্ঠী দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার।
যোগীন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্ধার
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর-অলি ফুলে বসে আছে শশধর

ফুলের উপর লিখছেন বিধি দেবতা আদি
বুঝা ভার সাধ্য হয় কার।
গরল ফুলের চতুর্ধারে তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে
এমন সাধু কোথাকার রে শুনে লাগে ভয়
সে স্থলে বারো পুষ্প ফোটে বারো মাস দেখা যায়
অলগ্নে খেললে জুয়া কত ফুল পড়ে ভুয়া
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়
ফুল যেনসে চাঁদের তুল্য তাকলেগেযায় দেখতে তার।
সে ফুল পায় কোন জন
হক নজরে দয়া করে দিয়েছেন বিধি যারে যেমন।
ওরে পাগলা কানাই না ধরে বিচার
করে মিছে কাঠকাছারী সার।

পাগলিনী

বেশ লুক লুকোনি খেলতে শিখেছ বাঁকা নন্দলাল
অধরা মন অমন দ্বারে ধরা যে পড়োছ।
তোমার চাতুরালি আর চলে না
অচেনায় বেশ গেল চেনা
এতদিনে গেল জানা তুমি অরূপ রূপে আছ—
দ্বিদলক কমল পরে আজ্ঞাচক্রে মনের ঘরে
রতনবেদীর পরে প্রকাশ রয়েছ।
জগৎনাড়ীর নাশা তার ভিতরে তোমার বাসা
আমায় দিয়ে দশম দশা দশমে বসেছ।
তাই দশম-ঘাট আশ্রয় করে
বসে আছি তোমার তরে
তুমি একাদশে পাগলিনীর চোখের কাছে নাচ।

পাঞ্জ শাহ্‌

যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
তার গুরু প্রতি সদায় মতি গুরু ভিন্ন নাই গতি
যেমন ইন্দ্রাবারি নিষ্ঠা ক'রে রয়েছে চাতক জাতি।
তার সাক্ষী দেখ রাম-অবতারে শিষ্য হনু
রাম নিষ্ঠা করে
কৃষ্ণপ্রাপ্তি পশুর হলো নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি।
গুরু নিষ্ঠা হ'লে ভজনের উপায় আছে সত্য
সর্বশাস্ত্রে কয়
সত্যপ্রেমী গণ্য হয় তার শমন পারে না ছুঁতি।
যার বাঞ্ছা আছে শ্রীচরণ ব'লে
পরের কথায় সেকি যায় ট'লে
ভুলো না মন কারো ভোলে করি তোমায় মিনতি।
যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরের সাথে
পিরিত করেছিল জগতে
পাঞ্জ বলে সতের সাথে ম'লেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি।

শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে পাবি
ওরে মন-পাগেলা
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে
করছে খেলা।
কতজন জপে মালা তুলসী-তলা হাতে ঝোলে
মালার ঝোলা
আর কতজন হরি বলি মারে তালি নেচে গেয়ে
হয় মাতেলা।
কত জন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে
দিয়াছে নেলা।
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে

আল্লা আল্লা ।
স্বরূপের মানুষ মিশে স্বরূপ দেশে বোবায় কানায়
নিত্য লীলা
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত
গাজীর চেলা ।
নিত্য সেবায় নিত্য লীলা চরণ মালা ধরা দিবে
অধর কালা
পাঞ্জ তাই ক'রে হেলা ঘটল জ্বালা কি হবে
নিকাশের বেলা ।

□

ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর
ভবের হাটে খুঁজে দেখে ভাল এক ঘরামি ধর ।
অনুরাগের আড়া কর আল্লার নামে খুঁটি গাড়
রূপের পেলা মার
ঝড়ি ঝটকা কি করবে তোর মহাসুখে বসত কর ।
ধর রে ঘরামির চরণ হৃদপদ্মে কর ধারণ
চিন্তা নাহি আর
দুষ্ট যত আপন হবে কেউ রবে না পর ।
পঞ্চবাণের ছিলে ধরে ক্ষান্ত কর কাম-অসুরে
মাল যাবে না আর
ঘরামিকে স্বামী করে মহাসুখে বিলাস কর ।
ঘরের মালেক মটকায় আছে মনুরায় তাইরি কাছে
রাখ হুঁশিয়ার
হীরুচাঁদ কয় পাঞ্জ যাবি চরণ ধ'রে ভব পার ।

□

জেতের বড়াই কি
ইহকাল-পরকালে জেতে করে কি—
আমার মন বলে অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখে ।
এক জেতের বোঝা ল'য়ে চিরকাল কাটালাম
মানী মানুষ হ'য়ে
মানের গৌরব কুলের গৌরব ধন্ধবাজি সব দেখি ।
লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়

হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় ক'রে বয়
কার বা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি।
জেতে অন্ন নাহি দিবে রোগে না ছাড়িবে
পাপ করিলে কোম্পানী সব জাত ধ'রে ল'য়ে যাবে
মৃত্যু হলে যাবে চ'লে জেতের উপায় হবে কি।
মন ডাকো আল্লা বলো কুলের গৌরব ফেলে
অকূলের কূল মালেক আল্লা তাইরি লেহ চিনে
পাঞ্জ বলে যত করলাম সকলই ফাঁকিজুকি।

□

রসের কথা অরসিকে বলো না
কারে বলো না কেউ ত হবে না
যেমন কয়লাকে দুগ্ধে ডুবালে দুগ্ধের বরণ ধরে না।
এক মহারাজ বাঞ্ছা করলে তিতো মিঠা করব বলে
করলে শতভার চিনি দিয়ে নিম্ববৃক্ষ রোপণা—
তাহে তিনগুণ তিতো বৃদ্ধি হলো
মিঠাগুণ তার হলো না।
যেমন কাক-তোতা এক খাঁচাতে যত্ন করো পোষ মানাতে
বুলি ধরাইব বলে খেতে দেও মাখন-ছানা
তোতা বুলি ধ'রে নিবে কাকের বুলি হবে না।
এক দরিদ্র জংলা হতে দাঁড়ায় বাদশার দ্বারেতে
বাদশা তারে দয়া করে দিল ডাব-চিনি-পানা—
ডাব কামড়ে খেতে দন্ত ভাঙে ছুলে খেতে জানে না।
রস-নগরে বিষম নদী ডুবলি নে মন জন্মাবধি
হীরুচাঁদের বাক্য ভুলে হ'লি টোপা-পানা।
অধীন পাঞ্জ বলে ডুবে দেখ মন পাবি মতি-দানা।

ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হও গে।
জগৎ-জোড়া মেয়ের বেড়া রে কেবল
একপতি সাঁইজী জাগে।

মেয়ে সামান্য ধন নয় জগৎ করছে আলোময়
কোটি চন্দ্র জিনি' কিরণ বুঝি আছে মেয়ের পায়—
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে তা হবে না কোনো যোগে।
যদি রূপার টাকা পায় জীবে কপালে ছোঁওয়ায়
কত রজত-কাঞ্চন সোনা-রূপা পতি দিচ্ছে মেয়ের পায়—
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব
পড়বে পাপের ভোগে।
মেয়ে মেরো না রে ভাই মারলে গুরু মারা হয়
মেয়ের আহ্লাদিনী নাম রেখেছেন চৈতন্য গোঁসাই
ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে ও তার
চরণে শরণ নিগে।
বলে হীরুচাঁদ আমার মেয়ে মনোহর
যার আকর্ষণে জগৎপতি করল রাধার দাস স্বীকার
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে পাগু
মেয়ের চরণ ধর আগে।

প্রসন্নদাস গোঁসাই

এমন দিন কবে হবে পাব মনের মানুষ-রতন
আকারে নয়ত মানুষ প্রেম ধরম তাহার লক্ষণ।
প্রেম-রসের মানুষ যারা জীয়ন্তে মরেছে তারা
রিপুচয় তাদের সারা রয়েছ জীবন।
প্রাণ কাঁদে যার মানুষ তরে মানুষ এসে দয়া করে
সেই মানুষ বিরাজ করে দেখ এই চৌদ্দ ভুবন।
মানুষ ভেবে মানুষ হবে
যেন সাপের খোলস ছেড়ে যাবে
ভাবময় দেহ পাবে হবে সেই দেহে প্রেমের সাধন।
শ্রীচৈতন্য মানুষের নাম গোলোক বৃন্দাবন যাহার ধাম
কেউ বলে তারে নব ঘনশ্যাম কেউ বলে গৌরবরণ।

এক মানুষ জগতের নাথ গৌর-নিত্যানন্দ-সীতানাথ
শ্রীবাস গদাধরের নাথ আছে সর্ব তন্ত্রে নিরূপণ।
মহামায়ায় দিন-কানা আমি দেখি মানুষ নানা
এখনও ভ্রম গেল না পাঞ্জী কে আছে আমার মতন।
গোঁসাই প্রসন্নেরি দাস অধম আমার এই অভিলাষ—
রাখ গুরু চরণের পাশ দয়ায় করাও মানুষ-দরশন।

ফিকিরচাঁদ

কত কাল আর ঘুমাবে বল
ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল—
ওরে দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল অন্ধকারে ঢাকিল।
দরদালানে কপাট দিয়েছ
ওরে আপনার ঘর যে খোলা আছে তা না দেখিছ
ভোলা মন
কত বদমাইসে মনের খোষে তোর ঘরে যে ঢুকিল
দেখে তোর ঘুমের ঘোর ভারি
কত চোর ডাকাতে ঘরে ঢুকে ক'ল্লে রে চুরি
ভোলা মন
যত ছিল রতন সোনার ভূষণ মনের মতন হরিল।
ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তোমার
ওরে জেগে জুগে ব'সে থাক হয়ে হুঁসিয়ার
ভোলা মন
কেবল জ্ঞান-হাতিয়ার সকল চোরার
দমন করার কৌশল।

□

আমি কে আমায় কেবা চিনেছে।
আমি ঐ খেদে যে কেঁদে মরি আমায় সবায় ভুলেছে

আকাশ পাতাল সমুদায় কোথা আমি ছাড়া নয়
আমি ছাড়া হলে অমনি হয়ে যেত লয়
আমি নাইরে যথায় এমন স্থান এই
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আছে।
যারা চেনে না আমায় তারা বলে সর্বদায়
কিছুদিন পরে আমি রব না হেথায়
আমি হেথা ছেড়ে যাব যথা
আমি সেইখানেই ত রয়েছে।
কেমন ছলনা মায়ার ভুলায়েছে সবাকার
ফিকিরচাঁদ সেই ধাঁধাঁয় পড়ে দেখিছে আঁধার
ভুলে আত্মতত্ত্ব সংসার লয়ে
কেবল আমার আমার করিছে।

□

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি চতুরালি করে রে
মন তাই বল না
সে যে হয় জগৎকর্তা বিচারকর্তা অন্তর্যামী
তা জান না।
সে যে তোর হৃদে জাগে মনের আগে দেখে রে
সে সব ঘটনা
সে যে হয় মনেরই মন যার যেমন মন
সকলি তাঁর আছে জানা।
ওরে যার মন নয় সোজা আঁখি বোজা
কেবল রে তার বিড়ম্বনা
তুমি এই ভবে এসে লোভের বশে
যখন কর যে ছলনা।
সে ত রে সব দেখেছে তার কাছে রে
ছাপালে ছাপা থাকে না।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান
সেত নয় রে ড্যারাকানা
তার চোখে ধূলা দিয়ে ছাপাইয়ে যাবে সেরে
তা হবে না।
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি যা করেছি সব জেনেছে
সেই একজনা

ভেবে আর নাই রে উপায় সব অনুপায়
দয়াময়ের দয়া বিনা।

□

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর!
নাই তার জলে গোড়া আকাশ-জোড়া সমান ভাবে
নিরন্তর।
কমলের সহস্রেক দল
তাতে বিরাজ করে সোনার মাণিক কিবা সে উজ্জ্বল
তারে যে জেনেছে যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর।
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা
আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা
কেবল পায়রে দেখা যারা বোকা সাপের ফণা ভয়ংকর।
ফিকিরচাঁদ ফকির বলে
সেই সাপকে ধরে বশ করেছে যে জন কৌশলে
কেবল সে পেয়েছে নিজের কাছে
সোনার মানিক মনোহর।

□

যদি কল্পনা করে অরূপীর সে রূপ দেখা যেত
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত।
কত জল্পনা করিত
লোকে কল্পনার জল পান করি শীতল হইত।
মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গ'ড়ে দিত
যাদু তোর মা এই বলিত
শিশু আমার মা বলিয়ে ছবির কোলেতে উঠিত।
যদি কল্পনাতে রূপ গ'ড়ে মা ব'লে কাঁদিত
তবে বুক কি জুড়াত
প্রাণের সাগর উথলিয়ে বক্ষস্থল ভাসিত।
কাঙ্গাল বলে যদি লোকে সাধন করিত মায়ের
চরণ পূজিত
তবে চোখে নাকে কানে জিভায় সে রূপ দেখিত।

□

এ ঘরেতে বসত করা হল রে দায়
ডানে চালাইলে মন চলে বাঁয়।
এই নবদ্বারী ঘর দেখিতে সুন্দর
পূর্ণ ছিল বিস্তর মণিমুক্তায়।
ছজন বোম্বেটে জুটিয়ে সে রতন বেচিয়ে
গরল কিনিয়ে খাওয়ায় আমায়।
তারা ফাঁকি দিয়ে
লোকে কথায় বলে বাহিরের চোর হলে
সাবধান কৌশলে তায় বাঁচা যায়
আমার ঘরের মাঝে চোর সদাই করে জোর
মন প্রহরী যোগ দিয়েছে তায়।
আমার ঘর সন্ধানি
কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন ঘরের চোর ছ জন
স্বাধীনতা রতন সব লুটে খায়
আমি ঘরের রাজা হয়ে সকল খোয়াইয়ে
নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায়।
আমি প্রভু হয়ে।

□

ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার নামেতে
পাষাণ গলে
যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন শূন্য পবন
স্থলে জলে।
কি বা আশ্চর্য কথন নাই তাঁর চরণ
সমভাবে বেড়ান চলে।
যিনি এই গাছ গাছড়ায় দালান কোটায় পত্র-কুটীর
ঘরের চালে
তিনি তোর দেলের মাঝে বসে আছে ভালমন্দ
কথা বলে।
যিনি সেই চীন তাতারে রুম সহরে বর্মা-কাশ্মীর
ঝিল নেপালে

তিনি তোর ভাতের গ্রাসে খাটের পাশে নাচিয়ে বেড়ান
লয়ে কোলে।
যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়ীতে বেদ পুরাণ
কোরান বাইবেলে
তিনি তোর খোল খমকে ঢোলে ঢাকে আল্ খেল্লায়
ফুরফুার ঝোলে।
যিনি সেই মসজিদ গির্জায় ব্রাহ্মসভায়
শ্মশানে কি গাছের তলে
তিনি মোহন্ত আখ্ড়ায় তুলসী তলায় সর্বস্থানে
ভূমণ্ডলে।
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে পেঁড় ক্ষেত্রে ঘোষপাড়া কি
বিন্ধ্যাচলে
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কাশীধামে মক্কা মদিনা চিথুলে।
যিনি সেই জ্ঞাতি হিংসায় বিবাদ ঘটায় যুদ্ধ বাধায়
সন্ধিস্থলে
তিনি যে অধীনতা স্বাধীনতা যা বল তা সবার মূলে।
যিনি সেই গড়ের মাঠে মনুমেন্টে রেলের রোডে
ধুমকলে
তিনি যে নেড়া মাথায় জুল্‌পী খোপায় টাকপড়া কি
আলবার্ট চুলে।
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে চূণে পানে দধিদুগ্ধ শাক অম্বলে
তিনি তোর ধুতি চাদর জামার ভিতর
কোট পেন্টুলন শাল রুমালে।
যিনি সেই নাটক যাত্রায় ঢপ্ অপেরায় কবিকঙ্কণ
কবির দলে
তিনি পাঁচালীর ছড়ায় হাফ আখড়ায় ঝুমুর খেমটা
বাঈ মহলে।
যিনি সেই কথকতায় রসিকতায় বক্তৃতায় কি পণ্ডিত
টোলে
তিনি তোর ছেঁড়া ছালায় কৌপীন ঝোলায় গোধুড়ি
কিম্বা কম্বলে।
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধ'রে মূল হারালি
ভুলের মূলে

থুয়ে ধন চালের বাতায় জল যে হাতড়ায়
তাকেই লোকে পাগল বলে।

বদিওজ্জমান

আল্লা তুমি বিনে আমার কেহ নাই এই ভব সংসারে
আল্লা তুমি সকল কাজের কাজী
নূর রূপে তুমি দেহের বাতি
আবার সেই নূরেতে হয় রে আলো এ তিন সংসারে।
আল্লা তোমার নামটি কাদের গণি একমাত্র উপাস্য তুমি
অন্তর্যামী মানুষ তুমি আবার তুমি
আছ জগত জুড়ে।
আল্লা তুমি আসমান তুমি জমিন
তুমি পবন তুমি পানি
আবার হাওয়া রূপে আছ তুমি জীবের অন্তর
বাহিরে।
আল্লা তুমি পাপ তুমি পুণ্য তুমি হে জগৎ মান্য
আবার ধর্মরূপে আছ তুমি এ মরজগতে।
আল্লা তুমি দিবা তুমি রাত্র তুমি সূর্য তুমি চন্দ্র
আবার তুমি হও মহামন্ত্র জীবের অন্তিম শয়নে।
ভেবে বদিওজ্জমান কয় আল্লা তুমি ছাড়া কিছুই নয়
সর্বজীবে আছ তুমি কেন মরি ভব ঘুরে।

বাঁকাচাঁদ

এবার আপনার ভজন আপনি কর
আপনি হইয়ে সাবধান
খুব হুসারিতে থেক রে মন
পূর্ব কথা হইবে স্মরণ।
ও তোর কাছের মানুষ কাছে আছে
চেয়ে দেখ ঊর্ধ্ব নয়নে
শূন্যেতে আসন করে
বেদ বিধির অগোচরে
মানুষচাঁদ বিরাজ করে অতি নির্জনে
এবার নয় দরজায় কপাট এঁটে
বস্তু কর নিরীক্ষণ।

□

কত দেবতাগণে সাধন করে
মানব রূপ করিয়ে ধারণ
এই ভবে এসে মানুষ বেশে
মানুষের করতেছে সাধন।
ধন্য কলি মানুষ ধন্য
কলিতে মানুষ অবতার
পাইয়া মানব দেহ এ মানুষ চিনলি নাকো
ভেবে দেখ মানুষ বিনে
গতি নাইকো আর।

মতিচাঁদ গোঁসাই

রাগ না জেনে রাগের ঘরে যাবি কি ক'রে
সেথা লোভী কামী যেতে নারে জন্মাবধি ঘুরে ঘুরে।
রাগ-রতি দু'টি হয় এ ভবে জেনে লও নিশ্চয়
অনুরাগী জনা রাগের ঘরে তালা খোলা পায়।
গুরুর কৃপা বলে অবহেলে
রূপের ঘরে গিয়া ধরে তারে।
এই ভবে পণ্ডিত যে জনা ও সে আছে মন-কানা
ও সে শাস্ত্র ঘেঁটে মরে তত্ত্বের মর্ম জানে না।
আপন জন্মযোগের নাই ঠিকানা পরের বিধান কি
দিতে পারে।
মনে মনে দেখ বিচার ক'রে
ও তুই কোন যোগ ধরে জন্ম নিলি এই ভবের মাঝারে।
যে যোগে শঙ্কর যোগী হয় মৃত্যুকে করেছে জয়
গোঁসাই মতিচাঁদ কয় এ বিধান
তালপাতাতে লেখা নয়
থাকতে বিকার সাধ্য কি তার সেই রাগসহরে যায়
ভেকের বাসনা যায় কি ভব পারে।

মদন শাহ্

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম তারে তোমরা বল কি।
ঘর আছে তার দুয়ার নাই মানুষ আছে বাক্য নাই
কে তাহাদের আহার দেয় কেবা দেয় সন্ধ্যাবাতি।
ছ মাসে হয় জীবের স্থিতি ন মাসে হয় গর্ভবতী
হয় এগারো মাসে তিনটি সন্তান
কোনটি করবে ফকিরি।
বত্রিশ বাহু ষোল মাথা গর্ভে ছেলে কয় গো কথা
কেবা তাহার মাতা পিতা এই কথাটি জিজ্ঞাসি।
বলে মদন শা ফকিরে মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে
এই চার কথার অর্থ বললে তারই হবে ফকিরি।

মনোহরদাস

রসিক রসিক সবাই বলে রসিক মেলে কয় জনা
যেমন জলছাড়া মীন বাঁচেনাগো তেমনি রস বিনে
রসিক জনা।
রায় রামানন্দ রসিক ভাল পঞ্চরসের বিধান ক'রে গেল
সে রস আনের ভাগ্যে মিলবে কেন
ও সে রস সাধন করে সাধক জনা।
দিবানিশি রমণ করে রসিক সুজন বলে তারে
রসিকের রমণ সাধন রমণ ভজন

রসিক তো রমণ ছাড়া থাকে না।
কেবল স্ত্রী পুরুষে রমণ করা নয়
আত্মায় আত্মায় রমণ হলে রসিক তারে কয়
তারা শুধু আত্মাকে ভেদ করিয়ে সদাই
লক্ষ্য-পানে দেয় হানা।
কৃষ্ণ অধর বলছে বাণী মনোহর তুই আর হ'সনে ঋণী
নেত্র কোণে গুণের করণ যেন রমণ করা ভুল না।

মাফেলদ্দি

একাপ্রভু আর যাবো না ভব-তরঙ্গে।
আমি আশি লক্ষ বার ঘুরেছি হারিয়েছি মন
নানা রঙ্গে।
টলমল ফুল ডালিমদানা ঝিলিক মারে কাঁচা সোনা
দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না ঐ নদীর উলাঙ্গে।
ত্রিমোহিনীর বিষম সন্ধি হ'ল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বন্দী
আমি বাদাম রসি কোষে বাঁধি
আমার মন-মাতঙ্গের ডুরি ছিঁড়ে
হাল ছুটে জলের ছিটে লাগে অঙ্গে।
যাত্রা করলাম সহজ দেশে মাফেলদ্দির কপাল দোষে
বারে বারে তক্তা খ'সে গঙ্গায় ভেসে তাতে হীরা লাগাও
গাবকালি দাও হালখানা লও চল রঙ্গে।

মিয়াজান ফকির

সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে মাসে
শুভযোগ না পেলে থাকে না ফুল খোয়ায়।
এসে যায় ভেসে অন্বেষণ কেউ না পায়
জগতে কতই ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল
ঘুরছে আশাতে ফুল যদি ধরত ফল
তবে বাবার গৌরব থাকে ত না
তাইতে এসে প্রবল হলেন মা।
বাবা হত গোবরে পোকা ফুলের মধু খেত না—
ছয় মাস অন্তে পুরুষের ফুল ওগো ফুটে
শোভা হয়েছে তবে কেন ফুল দরিয়ায় ভাসে।
শুভ যোগ পেলে ফুলের মোহর যায় এ'টে
পয়লা এক মাসের রক্তের দলা
দ্বিতীয় মাসে হইল গোল।
তেসরা মাসে হাতের সঞ্চার চৌঠা মাসে চৌদ্দ ভুবন
পঞ্চম মাসে পাঞ্জাতন ষষ্ঠ মাসে হয় ছয় জন রিপু
বসিলেন সপ্তম দ্বারেতে।
অষ্টম কুঠরীতে আল্লা গতে আট মাসে
নবম মাসে নবদ্বার দিয়াছে খুলে
দশ মাসে দশ জন রিপু-দশ বল যারে
দশ দিনের পর এল এ ভবে
ফকির মিয়াজান বলে সব দূরে গুণা
মাফ কর আজ।

যাদুবিন্দু গোঁসাই
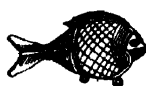
গোঁসাই যে ভাবেতে যখন রাখো সেই ভাবে থাকি
অধিক আর বলব কি।
কখনো দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনো জোটে না ফে র আমানি
কখনো আ-লবণে কচুর শাক ভখি।
এ কুলআলম তোমারি ওহে কুদরত নেহারি
তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী তুমি দীলবারি।
তুমি খাও তুমি খিলাও তুমি দাও তুমি দেলাও
তৈয়ারী ঘর ফেলে তুমি পালাও
সকলকে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকি।
দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
মান অপমান তোমার হাতে সুনাম বদনামী।
তুমি হও রোগীর ব্যাধি তুমি বৈদ্যের ঔষধি
তুমি এই সকলকার বলবুদ্ধি
তোমার ভাবভঙ্গি বোঝা ঠকঠকি।
তুমি সর্বঘটে রও তুমি সর্বরূপ হও
ভালো কথা মন্দ কথা সবই তুমি কও।
কহিছে বিন্দুযাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু
আমি এই কুবিরচাঁদ বলে ডাকি।

□

আমি সুখের নাম শুনেছিলাম দেখি নাই তার রূপ
আমার দুখনগরে বাটী পরিবার দুঃখরাজার বেটি
দুজনায় দুঃখে করি কালযাপন।
সুখের দেখা পাবো বলে এসেছিলাম ভূমণ্ডলে

ঘটলো নাতো এই কপালে কোনখানে সে হ'ল গোপন।
আমি খুঁজে খুঁজে জগত মাঝে
পেলাম না তার অন্বেষণ।
মনে করি সুখের দেশে সুখী হ'য়ে থাকবো ব'সে
দুঃখু বেটা তাড়িয়ে এসে কেশে ধরে করে শাসন।
আমি দুঃখের পথে দুঃখের মতে
দুখের নাম করি সাধন।
দুঃখের বসন ভূষণ পরে ঘুরে বেড়াই দুখ-সহরে
দুখের বেলা দুই প্রহরে দুখের অন্ন করি ভোজন
দুখের শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে দুঃখেতে করি শয়ন।
দুঃখু আমার মুক্তি গতি দুঃখু আমার সঙ্গের সাথী
হৃদয়ে জ্বলে দুখের বাতি দগ্ধ করে দিলে জীবন।
আমার দুখের কথা রইল গাঁথা করবে কে তা নিবারণ।
যাদুবিন্দু মনের দুখে কুবির কুবির বলে ডাকে
একবার দেখা দাও আমাকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
আমি তোমায় পেলে তোমার বলে
দুখের শির করি ছেদন।

মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে পাইনে উদর পুরে
লয়ে ঝুলি কাঁধে মনের খেদে
বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে।
বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত ভূত খাটুনি খাটব কত
রৌদ্রে পুড়ে মরব কত মনের দুঃখ কই কারে।
ঘরে থাকতে পোড়াকপালীরে বলে মিনসে আয়গা
ফিরে।
নামে কুঁড়ে কাজে কুঁড়ে ভজন নাই ভোজনে ডেড়ে
পাত পাড়ি মেঝে জুড়ে হাবু খুলে হা-ঘরে।
আমার ঘরেতে বৈষ্ণবী আছে পণকাঠা চাল
চিবিয়ে মারে।
তিনি দেবী আমি দেবা আমি করি ঠাকুর সেবা
বলেন আমায় ঠাকুর বাবা শুনে বড় রাগ ধরে।

তিনি বলেন সদা খাব খাব কোথায় পাব
খাওয়াই তারে।

□

রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ হয়েছে রে মন আমার
পরেছ রঙিন বেহাল গাঁজায় মাতাল
ভজনের লেশ নাই তোমার
তোমার রসনায় বাসনা করে মিছরি মাখন সরভাজার।
সে ধর্ম জানে যে জনা কভু শাকে নুন জোটে না
কভু গলিত পত্র করে আহার কভু থাকে উপবাসী
রূপ-সনাতন যে প্রকার।
বেশ করে বেঁধেছ খোঁপা চারি দিকে পুষ্পচাপা
আয়না ধরে দেখছ মুখের বাহার—
গলার মালা ছিঁড়ে মাথা নেড়ে যাবে ভবসিন্ধু পার।
বাড়ি বাড়ি ভাত তরকারি করে বেড়াও মাধুকরী
তাতে কি ভাই ঘুচবে মনের বিকার
গিয়ে রূপনগরে রূপের ঘরে করলে না সেই
রূপ নেহার।
রঙ্গে মেতে সঙ সাজিলে তাতেই কি সেই রত্ন মেলে
গোঁসাই কুবির কহিছেন বারে বার
যাদুবিন্দু ঢেঁকি ফাঁকিজুকি দেখলে না সাধুর
বাজার।

গুরু ত্যেজে হরি ভজে পাইনাকো নিস্তার
পরকালের কার্য কিন্তু হয় না তার।
যে জন গুরু চেনে না ভজনহীন ডহরকানা
সে পাপী গুরুর কথা শোনে না।
হয়ে রয় ঘাসের প্রজা মন রাজার গুরু অমূল্যরতন
গুরু বাক্য মূল ভজন—
গুরু কৃষ্ণ গুরু বোস্টম গুরু নিত্যধন
ও যে গুরুর চরণ করে স্মরণ হবে ভবসিন্ধু পার।

যারা গুরুকে ভুলে হরি হরি বোল বলে
গাছের গোড়া কেটে যেমন আগায় জল ঢালে
তারা পাবে সাজা দেখবে মজা হবে ভূত রাজার এয়ার।
ধরে গুরুর চরণে থাকো হরিসাধনে
মোক্ষধামে যাবে চলে সাধনের গুণে
হ'ল গুরু ভক্ত জগৎ ব্যক্ত গলে হরি-মুক্ত-হার ।
ও যার গুরু নামে দ্বেষ মজা দেখবে অবশেষ
লোহার মুগুর মারবে শমন ধরে শিরের কেশ—
গোঁসাই কুবির বলে বিন্দুযাদু বুঝে নাও করে বিচার।

কঠিন ধর্ম ভজিতে নারি আমি আর ভেবে চিন্তে
কি করি
যদি হতাম মেয়ে দেহ দিয়ে থাকতাম গুরুর পায় ধরি।
গুরুশিষ্য হয় যদি রমণ আছে শাস্ত্রে গাঁথা সত্যকথা
নরকে গমন
আমি এক পা এগোই তিন পা পেছোই
ভয়েতে কেঁপে মরি।
গুরুপদে দেহারতি দান
ও যে করতে পারে জ্যান্তে মরে মহা ভাগ্যবান—
যদি মদন এসে ধরে ঠেসে পাঠিয়ে দেয় যমের পুরী।
লোভী গুরু কামী চেলা যার
ও সে কেমন করে হয়ে যাবে ভবনদী পার
ও যার শুদ্ধ প্রেম শ্রীগুরুর সনে পাবে
কিশোর কিশোরী।
কাঙাল যাদুবিন্দু দাসে কয়
আমার কুবির গুরু কল্পতরু রসিকের সময়
আমি দুষ্টু চেলা বাধিয়ে ঘোলা কুসঙ্গে ঘুরি ফিরি।

□

নোনা গাঙে সোনার তরী বয়ে যায়
ও সুরসিক নেয়ে ঠান্ডা হয়ে বাগ বুঝে পাড়ি জমায়।

অনুরাগী মায়া ত্যাগি হরিনামের গুণ গায়
ও সে গুরুপদ নেহার ক'রে বসে আছে হাল মাচায়।
লগি ধরে ধীরে ধীরে গভীর নীরের খবর পায়
ও সে জোয়ার হলে নৌকা খোলে
ছাড়ে না ভাঁটার সময়।
ঘাগী মাঝি কাজের কাজী পাল তুলে দেয় সুহাওয়ায়
ও তার রূপ রসানের তরীখানি
জল গাবি ধরে না গায়।
ছ'জন দাঁড়ি আজ্ঞাকারী সাধ্য কি যে গোল বাধায়।
তারা পোষ মেনেছে মাঝির কাছে ডুবে আছে
নাম-সুধায়।
গোঁসাই কুবিরচাঁদে বলে রসিকে পার হয় হেলায়
কাঙাল যাদুবিন্দুর টোলো ডোঙা ডুবে ম'লো
মাঝ বেলায়।

□

আমার এই কাদা মাখা সার হ'লো
ধর্ম-মাছ ধরবো ব'লে নামলাম জলে
ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল —
কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঙা
গেয়েছি কতকগুলো।
এই সত্য ধর্ম-বিলে সুরসিক বাগ্দী দুলে
শুদ্ধ ভাব-জালটি ফেলে আনন্দে মাঝ ধরছে ভালো।
আমি পড়লাম ফাঁকে মায়া-পাঁকে বলবুদ্ধি
চুলোয় গেলো।
কুসঙ্গে বিল গাবালাম কুক্ষণে জাল নাবালাম
ক্ষমা-খালুই হারালাম উপায় কি করি বলো
আমি বিল ধুনে পাই চাঁদা পুঁটি
লোভ চিলে লুটে নিলো।
পাঁচটা ভূত লাগলো পিছে মাছ ধরায় প্যাঁচ পড়েছে
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে আর বাদী জনা ষোল
আমি মাকাল পুজোর মন্ত্র ভুলে হয়েছি এলোমেলো।

গোঁসাই কুবিরচাঁদ ভাষে হুদার গদিতে বসে
এই যাদুবিন্দু দাসে পাঁচলোকির পাট মস্ত হ'লো
দিলে মোয়ানতাড়া মূর্খ মেড়া আপনার দোষে ম'লো।

□

বাঁকা নদীর বাঁকে মন আমার যাসনে তাতে
সাঁতার দিতে প্রাণ হারাবি ঘুল্যে পাকে।
বলি শোন্ কত দেব ঋষিগণ
তারা সব ভাবছে বসে কেমন তুফান দেবে।
নয়নেতে দে বলে বাঁকা ডরে
কন খ্যাপা তোর লাগবে ধোঁকা—
একেবারে হবি বোকা সত্য কথা কই তোকে।
ও তুই সাধ করে তায় দিলি ঝাঁপ
ভুললি গুরুর মন্ত্রযাপ
শেষ কালে খাবি খাবি পাবি কাকে।
নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে বিদ্যে বুদ্ধি রয় না ঘটে
কামনামে কুমির জুটে চিবিয়ে চুষে খায় তাকে।
ও হয় অপমৃত্যু সেইখানে ও তার
জীবে কি সন্ধি জানে
এ কথা বুঝতে পারে সাধক লোকে।
সেই নদীতে মাসে মাসে দিন-দুপুরে জোয়ার আসে
ডাঙা আর ডহর ভাসে বিদঘুটে বন্যে ডাকে।
ও তাই কহিছেন গোঁসাই কুবির বোকা যাদুবিন্দু
খুঁড়িয়ে পীর
চেলুতি নাম বাড়ালে কুঁড়ো মেখে।

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়ো রে মন তবে
শান্তিপুরে যাবি
সদা আনন্দে রবি।
আছে শান্তিপুর নদে কথা নয় সিধে

তেঘরি নদীয়ার মাঝে বিষম গোল বাধে
তোমায় করি বারণ তেঘরি যেয়ো না মন
মজা দেখাবে সে রাজার সমন
শেষকালে কোবলাতে ভ্যাবলা হবি।
সেই গুপ্তিপাড়া গোপন বৃন্দাবন
চন্দ্র যেমন করে রয় গোপন আসন
সাধকের কাছে রে তার সন্ধি পাবি।
আছে অম্বিকে কালনা চেপে ধ'রে তোর কললা
সামলাতে পারবি না জীবে যাবি রে গোল্লায়
শান্তিপুর রয় বহুদূরে
কালনাতে খাটবে না ফাকুর ফুকুর
কালের ঘা মেরে শেষে খাবি খাবি।
গোঁসাই কুবিরচাঁদ রটে ঐ নদীর নিকটে
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে
শোন যাদুবিন্দু বলি চিনে নে নদীয়ার গলি
তবে তো শান্তিপুরে যাবি—
নিতান্ত হ'সনা গোবরের ঢাবি।

রশীদ

যদি ধরবি রে অধর এই বেলা তোর
মনের মানুষ চিনে সাধন কর
বড় নিগুম ঘরে আছে রে মানুষ
ও আর সন্ধান আগে কর।
সাতে পাঁচে ঘর বাঁধিয়ে করিছে কাছারি
তিন থানাতে বিরাজ করে রে মানুষ
ও তার রূপ মনোহর।
পাঁচ কুঠুরিতে সাত মুহুরি লেখাপড়া করে
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে রে মানুষ খেলে অনিবার।

এক মানুষের তিনটি বরণ জানে সর্বজন
নবদ্বারে ঘুরে ফেরে রে মানুষ ও সে নিজে দীপ্তকার।
রূপের মুরারি সেই ত্রিভুবন-জোড়া
স্বরূপে মোহিত আছে রে মানুষ এই সর্বরূপ তার।
রশীদ বলে জেন্তে ম'রে সাধন ভজন কর
সহজে যাইবে ধরা রে মানুষ ও তুই গুরুর চরণ ধর।

□

ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন আমার তোমার
ঘরে ব'সে পাবে তারে কেন সন্ধান কর না।
ঘরে ঘরে তারি ঘটা দেখিলে ঘুচিবে লেঠা
না চিনে কপালে কালসিটা আর ফেলো না—
শুধু জায়নামাজে মাথা তোমার আর ঠুকো না।
জানিয়া নামাজের কায়দা চিনিয়ে করিবে সেজদা
সামনে রয়েছে খোদা কেন দেখনা—
না চিনে ভূতের সেজদা আর কোরো না।
কাবা কি মন্দির-ঘরে পুজে সবে তারি তরে
সেই ঘেরা সর্বস্তরে চেয়ে দেখ না
না চিনে ঘুরে মরে যত দিন-কানা।
ভূত-পূজা মোশরেক করে মেটেভূত পুজে' মরে
অনলে জ্বালাবে তারে ভেবে দেখ না
তুমি জেন্দা ভূতের পূজা কর বিপদ রবে না।
ঘোর ঘার যত ছিল পীর সব ভেঙে দিল
রশীদ তুমি মিছে কেন কর ভাবনা
ঘেরা চান্দ এই মন-আকাশে চেয়ে দেখো না।

রামকৃষ্ণ দাস

আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখি
তুমি কি পড়ে পণ্ডিত হয়েছ
তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি।
আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ সে তো নয় সামান্য
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জন বর্ণ ফলাতে গণ্য
সে যে স্বর ভিন্ন নয়
স্বর হতে হয় দুয়েতে মাখামাখি।
যারে গুরুতত্ত্ব কয় সে যে যুক্তাক্ষর হয়
স্বরবর্ণ জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝায়
ও যার স্বরেতে ভুল লেগেছে গোল
কি হবে যুক্ত শিখি।
যেমন আগে স্বরবর্ণ তেমনি সজ্ঞান ভিন্ন—
পরের জ্ঞানে সাধন-ভজন হয় না রে জান।
বল পরের দেখায় কে দেখিতে পায়
যদি নষ্ট হয় আঁখি।
দেহের কোথায় চারি ধাম ভ্রমি অবিশ্রাম
সেতুবন্ধ দ্বারকা আর বদরিকা যার নাম
গেলে জগন্নাথে সর্বজাতে একত্র মিশে থাকি।
যেমন তথায় একাকার এই ভিন্ন দুই নাইক রে আর
জাতিকুল মহৎ বিদ্যা সামাজিক ব্যাপার
যার লক্ষ হবে সব ঘুচিবে সূক্ষ্মভাব নিবে ছাঁকি।
লক্ষ্য হবে যার সে কি ভজে নিরাকার
স্বরূপে রূপ মিশায়ে রূপের সাধন কর—
রামকৃষ্ণ কয় অন্য জ্ঞান লবে না বৈদিক থাকি।

মানুষ মানুষ সবাই বলে কে করে তার অন্বেষণ
পঞ্চম স্বরে মনের সুখে ডাকেন তারে ত্রিলোচন।
চৌদ্দ শাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণ চার বেদের সরাণ
কদাচিৎ কেউ পায় তার সন্ধান যার আছে উদ্দীপন।
কোটি সমুদ্র গভীর অপার যে জানে সে নিকট হয় তার
কলমেতে না পায় আকার শুদ্ধ রাগের করণ।
রাষ্ট্র আছে ভূমণ্ডলে মথুরাতে জন্ম নিলে
কত লীলা প্রকাশিলে সেই কৃষ্ণধন।
রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে জানে কোন ভাগ্যবানে
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে জানেনা সে গোপীগণ।
নন্দসুত বল যারে সেই এসে এই নদেপুরে
হরিনাম দেয় ঘরে ঘরে শচীর নন্দন।
রাধাঋণ শুধিবে বলে রাই অঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে
হরি হ'য়ে হরি বলে
কোন হরিতে হরলে মন—
সব হারালাম কর্মদোষে দেখে শুনে লাগল দিশে
এই অকারণ।
পিতা আমায় যে ধন দিলে রত্নমণি তারে বলে
ভবকূপে দিলাম ঢেলে ছড়াইলাম অকারণ।
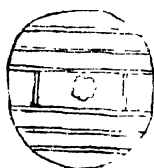
এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়।
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলেকে বসে।
আচিন দেশে বসতি ঘর
দ্বি-দল পদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবি অনায়াসে।
আমার হল কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ-সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে।

□

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়
আমি শব্দের ভারি আমি সে তো আমি নয়।
অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমার খবর নাই আমারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।
যখন না ছিল স্বর্গ মর্ত্য
তখন কেবল আমি সত্য
পরেতে হইল বর্ত

আমি হইতে তুমি কায়।
মনছুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সেই প'লো সাঁইর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায়।
কুম বেইজনি কুম বেয়েজনিল্লা
সাঁইর হুকুম দুই আমি হীলা
লালন বলে এ ভেদ খোলা
আছে রে মুরশিদের ঠাঁয়।

□

রাখলে সাঁই কূপজল করে আন্দেলা পুকুরে
হবে সজল বরষা রেখেছি সেই ভরসা
আমার এই দশা যাবে কত দিন পরে।
এবার যদি না পাই চরণ
আবার কি পড়ি ফেরে।
নদীর জল কূপজল হয়
বিলে বাওড়েতে রয়
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায় গঙ্গা না এলে পরে।
জীবের অমনি ভজেন ব্রহ্ম
তোমার দয়া নাই যার।
যন্ত্র পড়িয়ে অত্র রয় যদি
লক্ষ বৎসর যন্ত্রীবিহনে
যন্ত্র কভু না বাজতে পারে।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্র সুবোল ধরাও মোরে।
পতিত পাবন নামটি শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি
পতিত না তরাও যদি
কে কবে ঐ নাম ধরে।
লালন বলে তরাও গোসাঁই এ ভব-কারাগারে।

□

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।
দ্বি-দলের মৃণালে সোনার মানুষ উজ্জ্বলে

মানুষ-গুরু কৃপা হলে জানতে পাবি
এই মানুষে মানুষ গাথা
দেখ না যেমন আলেক লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা জাতে তরাবি।
মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শূন্যকার
লালন বলে মানুষ-আকার ভজলে তরাবি।

এমন মানব-জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তর কিছুই নাই
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছো এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী
সু ধারায় যেন ভরা না ডোবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠল নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে।

□

মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে মানুষ-নিধি
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনিতাম যদি।
অধর চাঁদের যতই খেলা
সর্ব উত্তম মানুষ-লীলা
না বুঝে মন হ'লি ভোলা মানুষ বিরদি।
যে অঙ্গের অবয়ব মানুষ
জানো না রে মন বেঁহুশ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ অনাদির আদি।
দেখে মানুষ চিনলাম না রে

চিরদিন মাথারো ঘোরে
লালন বলে এ দিন পরে
কি হবে গতি।

□

কে বোঝে তোমার অপার লীলে
তুমি আপনি আল্লা ডাকো আল্লা ব'লে
নরেকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারি
তুমি সাকারে সৃজন গঠলে ত্রিভুবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে।
নিরাকার নিগম ধ্বনি
সেও ত সত্য সবাই জানি
তুমি আগমের কুল দীনের রসূল
আবার আদমের ধড়ে জান হইলে।
আত্মতত্ত্ব জানে যারা
নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
ও সে নীরে নিরঞ্জন অকৈতবের ধন
লালন খুঁজে বেড়ায় বনজঙ্গলে।

□

খুঁজে ধন পাই কি মতে পরের হাতে
ঘরের কলকাঠি
শতেক তালা আঁটা মান কুটি।
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে
সদায় তারা আছে জুড়ে
দিয়েছি বের নজরে
ঘোর টাটী।
আপন ঘরে পরের আমি
দেখলাম না রে তার বাড়ি ঘর
আমি বেহুঁশ মুটে রে কার
মোট খাটি।
থাকতে রতন আপন ঘরে

এ কি বেহাত আজ আমারে
ফকির লালন বলে রে
মিছে ঘর বাটী।

□

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম কর্মকানা
না পাই দেখিতে।
রাজী হলে দরোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কই চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না গো চিনতে।

□

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনমভর একদিন দেখলাম না রে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাটবাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।
সবে বলে প্রাণ-পাখী
শুনে চুপে চুপে থাকি
জল কি হুতাশন মাটি কি পবন
কেউ বলে না একটা নির্ণয় ক'রে।
আপন ঘরের খবর হয় না

বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর
সে কেমন রূপ আমি কি রূপ ওরে।

□

বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশবিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।
দড়াদড়ি দিল্লী-লাহোর
আপনার কোলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেকসাঁই মোর
আত্মরূপ সে।
যে লীলে ব্রহ্মাণ্ডের পর
সেই লীলে ভাণ্ড-মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে।
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয় আলেক চেনা
হয় তার দিশে।

□

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে।
প্রথমে চাঁদে উদয় দক্ষিণে
কৃষ্ণপক্ষে অধো হয় বামে
আবার দেখি শুক্লপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিণে।
খুঁজিলে আপন ঘরখানা
পাইবে সকল ঠিকানা
বারো মাসে চব্বিশ পক্ষ
অধরা-ধরা তার সনে।
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন কিছুই নয়

ঐ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় তাই নির্জনে

আমার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখনা।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না।
আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বে তত লখনা।
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ
লওনা।
সাঁই লালন বলে মনের ঘোরে
হ'লাম চোখ থাকিতে কানা।

□

দেখলাম এ সংসার ভোজবাজীর প্রকার
দেখতে দেখতে অমনি কেবা কোথা যায়—
মিছে এ ঘরবাড়ি মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়।
কৃতিকর্মার কৃতি কে বুঝতে পারে
সে বা জীবকে ল'য়ে কোথা ধরে
সে কথা আর শুধাবো কারে
ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থ কে বলবে আমায়।
যে করে এই লীলে তারে চিনলাম না
আমি আমি বলি আমি কোন্ জনা
মরি রে কি আজব কারখানা

এবার শুনে পড়ে কিছুই ঠাওর নাহি হয়।
ভয় ঘোচে না আমার দিবা-রজনী
কার সাথে কোন দেশে যাবো না জানি
সিরাজ সাঁই কয় বিষম কার গণি
এবার পাগল হয় রে লালন
যে তাই জানতে চায়।

□

উদয় কাল কলি রে ভাই কলি আমি বলি তাই
হাগড়া বেঁধে নেংটি ছিঁড়ে লোক বুঝি হাসিয়ে যায়।
কলিকালে অ-মানুষের জোর
যত ভালো মানুষ বানায় তারা চোর
সমঝে ভবে না চলিলে
বোম্বেটের হাতে পড়বি ভাই।
কারে বিশ্বাস কেউ করে না
ওগো শঠে শঠে সকল কারখানা
ছিটে ফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র
কলির ধর্ম দেখতে পাই।
যত মা-মারা বাপ বদলানে
সবাই কলিকালে বেশী ভাগ পায়।
ফকির লালন বলে ঘোর কলিতে
ধর্ম রাখা কি উপায় গো কি উপায়।

□

ম'লে ঈশ্বর প্রাপ্ত হবে কেন বলে
সেই যে কথার পাইনে বিচার
কারো কাছে শুধালে।
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপতপ এত
করে রে জলস্থলে।
যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়

ম'লে তা যদি তাতে মিশায়
ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে।
জীবের এই শরীরে
ঈশ্বর-অংশ বলি কারে
লালন বলে চিনলে তারে
মরার ফল তা যায় ফলে।

□

গোল ক'রো না ও নাগরী গোল ক'রো না গো
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ।
সাধু কি ও যাদুকর
এসেছে এই নদী পুরি
খাটবে না হেথা জারিজুরি
তাই কি ভেবেছো।
বেদ-পুরাণে কয় সমাচার
কলিতে আর অবতার
তবে সে কয় সেই গিরিধর
এসেছে দেখো।
বেদে জানাই তাই যদি হয়
পুঁথি পড়ে কে মরতে যায়
লালন বলে ভজবো সবায়
তবে ঐ গৌরপদ।

□

গোরা কি আইন আনিল নদীয়ায়
এতো জীবের সম্ভব নয়।
আলগা বিচার আলগা আচার
দেখে শুনে লাগে ভয়।
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাইকো তাতে
প্রেমের গুণ গায়
জেতের বোল রাখলো না সে তো

করলো একাকারময়।
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদায়
আবার অসাধ্যকে সাধ্য করে
জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায়।
যবন ছিল দবীর খাস
তারে গোঁসাই পদ প্রকাশ
করলে গৌর রায় আর।
আবার লালন বলে মুসিল বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয়।

□

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে
আমার গৌরচাঁদ ত্রিজগতের চাঁদ
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে।
গৌরচাঁদে শ্যামচাঁদেরি আভা
কোটি চন্দ্র জিনিয়ে শোভা
রূপে মুনির মন করে আকর্ষণ
ক্ষুধা শান্ত সুধা-বরিষণে।
গোলোকেরি চাঁদ গোকুলেরি চাঁদ
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণচাঁদ
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে।
লয়েছি এই গলে গৌর রাঙ্গাচাঁদের ফাঁদ
আবার শুনি আছে পরমচাঁদ
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন
আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে।

□

এনেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে।
সাতবারে খেয়ে একবার চান

নাই পূজা নাই পাপপুণ্যে জ্ঞান
অসাধ্যরে সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে
না করে সে জেতের বিচার।
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচর
সত্য মিথ্যা দেখে প্রচার
সাঙ্গপাঙ্গ জাত অজাতে।
ভজ ঈশ্বরের চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয় তার উপাসনা
কর দেখি মন কি দোষ তাতে।

□

তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে
তিন পাগলে হলো মেলা নদেয় এসে।
একটা পাগলামো করে
কোল দেয় জাত অজাতেরে
দৌড়িয়ে যেয়ে।
ও তার নাই জেতের রোগ
এমন পাগল কে দেখেছে।
একটা নারকোলের মালা
তাতে জল তোলা ফেলা
করঙ্গ সে।
আবার হরি ব'লে পড়ে ঢলে
ধূলার মাঝে।
দেখতে যে যাবি পাগল
সেইতো হ'বি পাগল
বুঝবি শেষে
ছেড়ে তারো ঘর-দুয়ার
ফিরবি নে যে।
পাগলের নামটি এমন
বলিতে অধীন লালন
হয় তরাসে।
চৈতে নিতে অদ্বে পাগল

নাম ধরেছে।

□

মানুষ লুকাইল কোন শহরে
এবার মানুষ খুঁজে পাই নে গো তারে।
ব্রজ ছেড়ে নদেয় এলো
তার পূর্বান্তরে খবর ছিল
এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল
যে জানো বলো মোরে।
স্বরূপে সেই রূপ দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মত থেকে কোথা
প্রভু ক্ষণেক ক্ষণেক বারাম দেয় রে।
কেউ বলে তার নিজ ভজন
করে নিজ দেশে গমন
মনে মনে ভাবে লালন
এবার নিজ দেশ বলি কারে।

□

মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলে না সে এসব রূপী
ও যে মানুষ-রতন চেনে।
জিন-ফেরেস্তার খেলা
পেঁচোপেঁচি আলাভোলা—
তার নয়ন হয় না ভোলা
ও সে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।
ফেও-ফেঁপি ফেকসা যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা
লালন তেমনি চটা-মারা
ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে।

□

আল্লা বলো মন রে পাখি।
ভবে কেউ কারো দুখের নয় রে দুখী।
ভুলো নারে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে
মন রে আসতে একা যেতে একা
একা এ ভব পিরিতের ফল আছে কি।
হাওয়া বন্ধ হলে কিছুই নাই
বাড়ির বাহির করে সবাই
মন রে কেবা আপন পর কে তখন
দেখে শুনে খেদে ঝরছে আঁখি।
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে চায়
ফকির লালন বলে কারো গোরে
কেউতো যায় না থাকতে হয় একাকী।

□

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে।
হিন্দু-মুসলমান দুইজন দুইভাগে।
আছে বেহেস্তের আশায় মোমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন
বেহেস্তের মুখ ফাটক সমান
শরায় ভালো তাই জানে।
যায় ফকিরি সাধন ক'রে
খোলসা রয় হুজুরে
টল কি অটল মোকাম সেই
নেহাজ ক'রে জান আগে।
আখের অটল প্রাপ্ত কিসে হ
মুরশিদের ঠাঁই জানা যায়
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো
ভুগিস্‌নে ভবের ভোগে

এ কি আইন নবী কল্লেন জারি
পাছে মারা যাই আইন-সাধ ভাসা তারি।
শরীয়ত আর মারফত আদায়
নবীর আইন এই দুই হুকুম সদায়
নবুওত মারফত
জানতে হয় রে গভীরি।
নবুওতে অদেখা ধেয়ান আছে
বেলায়েতে রূপের নিশান
নজর একদিক যায় আর দিক আন্ধার হয়
দুই রূপ কি রূপে ঠিক করি।
শরাকে সরপোষ লেখা যায়
বস্তু-মারফত সে ঢাকা আছে তায়
সরপোষ তুলে দিয়ে ফেলে
লালন বস্তুভিখিরী।

□

আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে
রোজা আর নামাজ শরীয়তের কাজ
শরীয়ত আসন ঠিক বলছো কারে।
নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় শরীয়ত
শরা কবুল করো।
ভাবে বোঝা যায় কলমা শরীয়ত নয়
শরীয়ত আর পরমার্থ থাকতে পারে
বেইমান বেলীরে জনা শরীয়তের আয়েৎ চেনে না
মুখে তোড় ধরে।
চিনতো যদি আয়েৎ অদেখা নিয়াত
চিনতো না কভু বরজখ ছেড়ে
শরীয়তের গোস্তো ভারি
যে যা বোঝে সেই হবে আখেরে।
লালন বলে মর বুদ্ধিহীন অন্তর

আমি মারি মূল লাগে বৃক্ষের পরে।

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা
জাতিতে যে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্বধন তাই।
রামদাস মুচি ভবের মাঝে
ভক্তির বল সদাই তার যে
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে
শুনি সাধুর ঠাঁই।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হ'লো
ফকির লালন বলে মিছে কল
ভবে শুনতে পাই।

□

কারে বলবো আমার মনের বেদনা
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।
যে দুখে আমার মন
আছে সদায় উচাটন
বললে সারে না।
পুরু বিনে আর না দেখি কিনার
তারে আমি ভজলাম না।
অনাথের নাথ যে জনা মোর
সে আছে কোন অচিন শহর
তারে চিনলাম না।
কি করি কি হয় দিনের দিন যায়
কবে পুরবে মনের বাসনা।
অন্য ধনের নয়রে দুখী
মনে বলে হৃদয়ে রাখি

শ্রীচরণখানা।
লালন বলে মোর পাপের নাই ওর
তাইতে আশা পূর্ণ হলো না।

□

মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান-ছাড়া
সদরের সাজ করছো সদায়
পাছবাড়িতে নাই বেড়া।
কোথা বস্তু কোথারে মন
চৌকি পাড়া দেও হামেশ কোন্
কাজ দেখি পাগলের সমান
কথায় যেমন কাঠ ফাড়া।
কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
একদিন তো দেখলি নারে
পৈতৃক ধন গেল চোরে
হলি রে তুই ফোকতারা।
পাছবাড়ি আঁটনা করো
ঘর-চোরারে চিনে ধরো
লালন বলে নইলে তোরও
থাকবে না মন এককড়া।

□

থাকনা মন একান্ত হয়ে
গুরু গোঁসাইর বাক লয়ে।
চাতকের প্রাণ যদি যায়
তবু কি অন্যজল খায়
ঊর্ধ্ব মুখে থাকে সদায়
নবঘন জল চেয়ে।
তেমনি মত হলে সাধন সিদ্ধি
হবে এই দেহে।
এক নিরিখ দেখ ধনি
সূর্যগত কমলিনী

দিনে বিকশিত তেমনি
নিশিতে মুদিত রহে।
তেমনি যেন ভক্তের লক্ষণ
একরূপে বাঁধে হিয়ে।
বহু বেদ পড়াশুনা
সম্বিতে পায় রে মনা
সদাশিব যোগী সে না
কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে শ্মশানে মশানে
ফেরে কিঞ্চিতের লাগিয়ে।
গুরু ছেড়ে গৌর ভজে
তাতে নরকে মজে
দেখ না পুঁথিপাথি
সত্য কি মিথ্যা কহে।
মন তোরে বুঝাবো কত
লালন কয় দিন যায় বয়ে।

□

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি
গৌর দেখতে গুরু হারাই কোন রূপে দেই আঁখি।
গুরু গৌর রহিল দুই ঠাঁই
কি রূপে একরূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন
সকল হবে ফাঁকি।
প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি হবে কিসে হবে সাধনা
মিছে সদায় সাধুহাটায়
নাম পড়াই সাধ কি।
এক রাজ্যে হলে দুজনা রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে তেমনি গোলে
খাতায় প'লো বাকী।

□

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
ও এক পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে
আমি বাঞ্ছা করি দেখবো তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।
বলবো কি সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

□

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝোরে আঁখি
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখিনা ভাই
এতো বিষম ঘোর দেখি।
আমি চিনলে পেলে চিনে নিতাম
যেতো মনের ঢুকঢুকি।
পুষে পাখি চিনলাম না
এ লজ্জা তো যাবেনা
উপায় করি কি।
পাখি কখন কেন যাবে উড়ে
ধুলো দিয়ে দুই চোখি।
আছে নয় দুয়ার এই খাঁচাতে

যায় আসে পাখি কোন পথে
চোখে দিয়ে রে ভেল্কি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়
রয় লালন রয়
ফাঁদ পেতে ঐ পথমুখি।

□

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না।
খুঁজি তারে আশমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ ত বিষম ভোলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন সে কোন্ জনা।
রাম রহিম বলছে সে জন
সে জনা কি বায়ু হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।
আমার হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী শহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না।

□

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।
আট-কুঠরী নয় দরজা-আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা
তার উপর আছে সদর-কোঠা
আয়না-মত হয়না
মন তুই রৈলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে

কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখি কোনখানে পালায়।

□

দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের ঘরে ভাবের কীর্তি
জলের ভিতরে রে জ্বলছে বাতি।
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা
ভাবে বসে দেখ নিরালা
নীরেতে ক্ষীরেতে ভেলা বয়ে জুতি।
জ্যোতিতে রতির উদয়
সামান্যে কি তাই জানা যায়
তাতে কত রূপ দেখা যায় লাল মতি।
যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে
লালন কয় দেখবি তবে কি গতি।

□

কোন্ দেশে যাবি মন চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাই রে।
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্ন দোষ কি হয় না সেথায়
আপন মনের-বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে।
সঙ্গে আছে রিপু ষোল জন
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথা ঘটাবে রে।
পাগল ও কেউ ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে
সিরাজ-সাঁই কয় লালন
তোরও বুদ্ধি নাইরে।

□

এই দেশেতে এই সুখ হ'লো
আবার কোথা যাই না জানি
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা
জনম গেল ছেঁচতে পানি।
কার বা আমি কে বা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাই তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি।
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বাহিয়ে পাপের তরণী।
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন-গুণে
লালন বলে কত দিনে
পাবো সাঁইর চরণ দুখানি।

□

বিনে মেঘে বরষে বারি
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারি।
ও তার নাই সকাল বিকাল
নাহি তার কালাকাল অবধারি।
মেঘ মেঘেতে সৃষ্টির কারবার
তারাও সকল ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী।
নীরসে সুরস ঝোরে
সবাই কি তা জানতে পারে
সাঁইর কারিগুরি।
ও তার এক বিন্দু পরশে
সে জীব অনায়াসে হয় অমারি।
ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বারি
হতে শাপ বিমোচন হয় সবারি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়

লালন চিনে তার মহাজন থাক নেহারি।

□

করি কেমন শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে ওঠে কাম-নদীর তুফান।
প্রেম রত্নধন পাবার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধিলাম কষে
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
যায় বাঁধন ছাঁদন।
বলবো কি সেই প্রেমের কথা
কাম হলো সেই প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
নাই রে আগমন।
পরম গুরু প্রেম পীরিতি
কাম গুরু হয় নিজপতি
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি
তাই ভাবে লালন।

□

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে।
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়
দিন না জানতে আঁধার কি যায়
তেমনি জেনো হরি বলায় হরি কি পাবে।
রাজায় পৌরুষ করে
জমির কর সে বাঁচে না রে
তেমনি সাঁইর একরারী কাজরে
পৌরুষে ছাড়বে।
গুরু ধর খোদকে চেনো
সাঁইর আইন আমলে আনো
লালন বলে তবে মন সাঁই তোরে নিবে।

□

কি সাধনে পাইগো তারে
যার নাম অধর এই সংসারে
মুনি ঋষি হন্দ হলো ধ্যান করে।
কেউ ফকির কেউ হচ্ছে যোগী
কেউ মোহান্ত কেউ বৈরাগী
কারও বা কথায় মন সুতায় দেও গিরে।
ব্রহ্মজ্ঞানী খ্রীষ্টানেরা
নামব্রহ্ম সার বলেন তারা
দরবেশে কয় বস্তু কোথায় দেখ না রে।
গুরুতত্ত্ব বিধি শোনা যায়
তাও ত দেখি একরূপ সে নয়
লালন বলে, সে যা বোঝে
তাই করে।

□

কোন সাধনে তারে পাই
আমার জীবনের জীবন সাঁই।
সাধিলে সিদ্ধের ঘরে
শুনিলাম সেও পায় না তারে
মাধুর্যে মুক্তি পেলেও সে ব্যক্তি ঠকে যাবে
এমনি শুনি রে ভাই।
শাক্ত শৈব বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ লাভ
তবে দয়াময় কেন সর্বদায়
বিধি ভক্তি ব'লে দুষিল তায়।
গেল না রে মনের ভ্রান্ত
পেলাম না সেই ভাবের অন্ত
বলে মূঢ় লালন ভবে এসে
মন কি করিতে না জানি কি ক'রে যাই।

□

জানা চাই অমাবস্যে-চাঁদ থাকে কোথায়

গগনে চাঁদ উদয় হলে দেখে যে আছে যথায়।
অমাবস্যের মর্ম না জেনে
বেড়াই তিথি নক্ষত্র গুণে
প্রতি মাসে নবীন চাঁদ সে
মরি একি ধরে কায়।
অমাবস্যে আর পৌর্ণমাসী
কি ধর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসি
তোমরা যে জানো সে বলো বলো
মন জুড়াই আজ সেথায়।
সাতাশ নক্ষত্র হয় গণন
স্বাতী নক্ষত্রের যোগ কখন
না জেনে অধীন লালন
সাধক নাম ধরে বৃথায়।

□

চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়
সে যোগের উদ্দীপন যে জানে সেই সে:মহাশয়।
চাঁদ রাহু চাঁদেরি গ্রহণ
সে বড় করণ কারণ
বেদ পড়ে তার ভেদ-নিরূপণ
ও তুই পাবি রে কোথায়।
উভয় যেন বিমুখ থাকে
মাস-অন্তে সুদৃষ্টি দেখে
মহাযোগ তার গ্রহণ-যোগে বলতে লাগে ভয়।
ও সে কখন রাহুরূপ ধরে
কোন চাঁদে কোন চাঁদ ঘেরে
লালন বলে স্বরূপ-দ্বারে
লীলে জানা যায়।

□

গোঁসাইর ভাব যেহি ধারা
আছে সাধু শাস্ত্রে তার প্রমাণ আচার
শুনলে রে জীবন অমনি হয় সারা।

ও সে মরার সঙ্গে মরে
ভাবের সাগরে ডুবতে যদি পারে
সু-ভাবিক তারা।
দুগ্ধেতে ননীতে মিশালে সর্বদা
মন্থন-দণ্ডে করে আলাদা আলাদা
মনরে এমনি ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে
মুখের কথা নয় রে সে ভাব করা।
অগ্নি যৈছে ঢাকা ভস্মের ভিতরে
সুধা তেমনি আছে গরল হল করে
ও কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে
মন্থনের সুতার না জানে তারা।
যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকে মুখ লাগালে রক্ত এসে মেলে
অধীন লালন বলে বিচার করিলে
কু-রসে সু-রসে মেলে সেই ধারা।

□

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়
নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয়।
পঞ্চতত্ত্ব সাধন ক'রে
পেত যদি সে চাঁদেরে হে
ওরে বৈরাগীরা কেনে
আবাল গুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ-বাঞ্ছায়।
বৈষ্ণবের ভজন ভালো
তাই বলিয়ে ভক্তি ছিল হে
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সদায় বলে তারা
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয়।
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে করে তর্ক হে
বস্তুজ্ঞান যায় নাই নাম-ব্রহ্মা কি পাই
লালন কয় দরবেশে একি কথা কয়।

□

সবাই কি তার মর্ম জানতে পায়
সে সাধন ভজন ক'রে সাধকে অটল হয়।
অমৃত মেঘেরি বরিষণ
চাতক-ভাবে জানরে আমার মন
ও তার একবিন্দু পরশিলে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগ করে
মহাময়ী যোগ সেই জানতে পারে
ও তার তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সেধে নেয়।
বিনা জলে হয় চরণামৃত
যা খাইলে যায় জরামৃত
লালন বলে চেতন-গুরুর
সঙ্গ নিলে দেখায়ে দেয়।

□

সে কথা কি ক'বার কথা জানিতে হয় ভাবাবেশে
অমাবস্যা পূর্ণিমা সে পূর্ণিমা সে অমাবস্যে
অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ
আজব-সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খণ্ডে এ ভব রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে
রবিশশী রয় বিমুখা
মাস অন্তে হয় একদিন দেখা
সেই যোগের যোগে লেখাজোখা
সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে।
দিবাকর নিশাকর সদাই
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইসারাতে সিরাজ সাঁই কয়
লালন রে তোর হয় না দিশে।

লালশশী

তুমি সকলকে এক মানুষ বলে কল্লে বর্ণনা
সেই মানুষ এই মানুষে থাকে কিসে ভেঙ্গে বল না।
যদি ছোট বড় মাঝারি সব কল্লে একাকার
কেবা গুরু কেবা শিষ্য ভজন করি কার
যদি তুমি আমি ঘুচিয়ে দিলে তুমি
তবে কে আমি কার ভজন করে কে।

□

আঁখি ভ'রে যারে হেরে হচ্ছে আনন্দ
ঘুচিল মনেরি সন্দ
সে মানুষ কোথায় রে ব'লে নাই কোন সন্দ
সে মনের মানুষ মনে আছে
দিবারাতি তারির কাছে
হৃদয় মাঝে সেই সদানন্দ।

□

মন কি তোর মনের মানুষ চিনতে পারলি নে
ওরে যে তোরে সাজিয়েছে
রাজ্যভার দিয়েছে
সে কোথা অন্বেষণ তো কল্লি নে
স্বচক্ষে তুই সে লোককে তাকিয়ে দেখলি নে।

□

মিলবে তোর মনের মানুষ যা বলি তাই শোন
গুরুভক্তি অভিলাষে থাকবি তো বসে
নাম ধরে ডাকবি পরে ভোলা মন।

□

কাজ কি তোর মনের মানুষ বাইরে বার ক'রে
সদা নিত্য-সুখী হয়ে আত্মায় মিশাইয়ে
বসাইয়ে রাখ রে হিয়ার মাঝে।

□

ভাই রিপু ছয় ইন্দ্রিয় দশ আছে ষোল জনা
দেখ তাদের কথাতে ভুল না।
যেন বস্তু মজিও না ভাইরে
চেতন হয়ে দেখ কার বা কোথা স্হান
রাখবে সব স্হানে স্হানে যার যেমন আছে।
এরা যখন হইবে শান্ত
তখন দেখবে ভাই কোথায় আছে ঋতু বসন্ত
আর নীর ক্ষীরে একযোগে
নীর ফেলে ক্ষীর বেছে খাও।

□

দেখ সেই রসে এক নিমিষে সৃষ্টি হচ্ছে যত
উল্টা পাকে পড়িয়ে বিপাকে জীবে ঘুরছে অবিরত
আছে এর উপর এক মহাজন মানুষ রতন
যিনি বীজের বীজ সে রতন অমূল্য সে ধন।
তারে হঠাৎ কারে ধরতে নারে বিনা সৎসঙ্গ
সঙ্গ হ'লে রঙ্গ ধরিলে দেয়নাকো ভঙ্গ।
রাখে কায়দা করে নিমিকেরি জোরে
অন্তঃপুরে হেরে সেই কিরণ—
লালশশী বলে নিমিকেরি জোরে
অন্তঃপুরে হেরে সেই কিরণ।

□

গিন্নি যে রন না ঘরে আমরা করবো কি
সদা যান তিনি ভ্রমণে ইচ্ছা হয় যেখানে
শুধালে আসছি বলে দেন ফাঁকি।

মানে না কল্লে মানা এই ত ঠকঠকি
দেখ সওদা শুল্ক করতে যে লোক আসতেছে হেথায়
খিড়কি সদরের চাবি রাখিয়ে যান তিনি কোথায়
এরা দশ জনেতে যার যা ইচ্ছা করতেছে দেখাদেখি।

☐

ভইে রে এই দেশেতে নদীতে এসে জোয়ার ভাঁটা
ঘাট ভেড়াতে খোঁটায় কাছি দিতে
নৌকাতে বাধে বিষম লেটা।
করে মাল্লা জেলে ওই জলের কূলে কারখানা
তা না হলে এক তিলে কেউ
কোন কালে চলতে পারে না।
এ সব ডাঙ্গা ডহর সহর বন্দর সদর মফঃস্বল
রত্নাবতী মধ্যে ক্ষিতি আদ্‌ জলধি জল
লালশশীর বাণী কত জাহাজ দুনি
আমদানি বার পানিতে চলে।

সদানন্দ

বল্‌ হাওয়াতে কইছে কথা ও মন আলেকলতা
আমায় ছেড়ে যাও কোথায়।
দেহের করব যতন বিরাজ করেন মানুষরতন
তাহে বাদী রিপু ছজন
তার ছজন রিপু দমন হবে
হস্তীর উপর মাহুত যেমন
অংকুশ পেলে হয় খাড়া।
লাল জরদ শ্বেত পীত ষড়দলে বিকশিত
যায় সমুদ্রেতে
সে তো করে টলমল শতদল সহস্রদল

আলেক মানুষ বিরাজ করে সেই মানুষে
নিহার রেখে নিমাইচাঁদ মুড়ায় মাথা।
সাত দরজার কপাট এঁটে খিড়কি দ্বার আলগা রেখে
মন প্রাণকে চৌকি রেখে
তুমি যাও কোথায়।
কখন যাও কখন আসো স্বপনেতে চমকে উঠো
আজগুবি কারখানা দেখ কার সঙ্গেতে কও কথা।
মেহেরপুরকে সত্য বলি হাড়িরামের কথায় চলি
এই দেবে চৌষট্টি কোটি কর নিরীক্ষণ—
সদানন্দ ভাবছে বসে যেতে হবে মিশে
নয় দরজায় বারাম দিয়ে
পাবার বেলায় ঊর্ধ্ব দ্বার খোলা।

৮

এবার আপনার খবর আপনি জান রে মন
মানুষ কোথায় আছে কর নিরীক্ষণ।
আমি আমি সবাই বলে আমি কে চেনগা তারে
তার করগা অন্বেষণ।
এমন মানব জনম পাবি যদি
ধরগা হাড়িরামের ঐ চরণ।
তারে খুঁজেও পাওয়া যায়
আপনি-হারা হলে পরে কোথায় পাওয়া যায়
আপনাকে আপনি হতেছ হারা
খুঁজে করগা তার অন্বেষণ।
এই দেহেতে চৌদ্দ কোঠা
যেমন শোলার পাখী কয়গো কথা
শতেক হাড়ে পিঁজরাটা গাঁথা
হাওয়া বল্ ছাড়া এ কল রবে গো পড়ে।
শুধু খাঁচার কথা কবে না তোর
সদানন্দ ভাবছে বসে কি করবি মন শেষে
ও তার করগা অন্বেষণ
এমন মানব জনম পাবি যদি
ধরগা হাড়িরামের ঐ চরণ।

□

হাড়িরাম মানব-দেহে বানিয়েছে এক আজব কল
এই কলের সৃষ্টি বলে করা বল্ বিনে চলবে না কল।
এই কলের শতেক তাই জোড়া
মানবদেহে ষড়দল পদ্মে কলের সৃষ্টি
কারিগর ফেলেছে দাঁড়া।
মাপে চোদ্দ পোয়া করা আব আতস খাক বাত
দিয়েছে জোড়া।
দমে দমে চলছে এ কল রসনা
ভিতরে থেকে চলছে বল্।
এই কলের দুখান চাকা বাঁকা উপরে হেলছে দুই পাখা
দুজন কলে চৌকি আছে দুজন তাই দিচ্ছে পাহারা।
যেমন জলের ভিতরে আগুন আগুনের ভিতরে সে জল
কারিকরের করা এ কল মন আমার
কখনও তা হয় না অচল।
এ কলের পাশে চারখানা থাম আছে গো তার
দেখ দেখতে কি বাহার থামের তিন তার আছে
কারিগর খবর নিচ্ছে তার
মানে না ডাঙ্গা ডহর কল চলে দিল্লী লাহোর
হাড়িরাম কল মিস্ত্রী হেকমতে চালাচ্ছে কল।
কারিগর হেকমত করে আমি বলব কি তারে
কত শত প্যাঁচ বসালে আমার এই কলের ভিতরে।
কোন প্যাঁচে উঠায় বসায় কোন প্যাঁচে চলায় বলায়
কোন প্যাঁচে কারিগরের হাতে কখন টিপ দিয়ে
বন্ধ করবে কল।
এ কলের কারিগর কোথায় আমি বলব কিগো তায়
আলেকেতে বিরাজ করে যে মেহেররাজ শুনতে পায়
সদানন্দ ভেবে বলে হাড়িরাম চরণতলে দিও স্থল।

□

হাড়িরাম দীন দানব দেহ গঠন করে গো
পাঠায়েছে এ সংসারে—
এবার কুসঙ্গ কুপাকে পড়ে চিনলাম না সেই কারিগরে।

ওরে আমিও যার সকলে তার
ভেবে দেখো যে জন সৃষ্টি করে।
কেবল আমার আমার ব'লে
দখল করে জীব দিনান্ত রে
কাল-নিদ্রা এসে ভুলায় যখন তখন দখল তোমার
আর কে করে গো আর কে করে।
আমার জীবন নিশির স্বপন
পদ্ম পত্রে জল টলমল করে
রামদীন আলেক পতি জীবের গতি
অভয় চরণ দেন গো যারে।
জলের সুঁই পবনের সুতো গড়লেন দেহ সেলাই করে
দিলেন পঞ্চ পদ্ম বত্রিশ দন্ত
হস্ত পদ কর্ণ নাসা ক'রে।
সদানন্দ ভেবে বলে এইবার চল মন মেহেরপুরে
নিলে রামের স্মরণ হয় না মরণ
রামদীন চরণ দেন গো যারে।

স্বরূপদাস
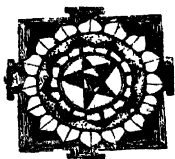
মনের মানুষের কি আকৃতি এ দেহের কোনখানে আসন
তুমি মন মন কর সর্বক্ষণ
আপনাকে ঠিক জেনে পরকে কর জিজ্ঞাসন।
মন পবন এরাই দুইজন তারা তো ধড়ের মহাজন
ধড় ছাড়া হ'লে পরে খালি ধড় কি আপনি চলে
নিরিখ নিরূপণ।
তার নয়ন চলে আগে আগে কলের ঘরে মন-পবন
শুনি তার নাই উপাসনা সে কারো দোহাই মানে না।
তাই রে লা-শরিকালা বলছে ওই জনা
জগতে তার তুলনা সে কারো সঙ্গে মিশে না।

তারা পাঁচজনে এক তারে খেলে ছবি নাচাচ্ছে যেমন।
স্বরূপের নাই বুদ্ধি বল সেই হইয়া অচল
দিলবর সাঁই গুণের নিধি সে মোরে চালায় যদি
আকবতে হতে পারি রাগের ভূষণ।
রাগ ছাড়া কিছু হবে না ভাই রাগের কর নিরূপণ।

হাউড়ে গোঁসাই

শ্রীরূপ-নদীতে এবার নাইতে নেবো না
করি রে মানা তথায় যেয়ো না কাম-কুম্ভীরে ধরবে তোরে
শেষে প্রাণে বাঁচবি না।
উদ্‌মুখে তরঙ্গে প'ড়ে জন্ম-ধারায় যাবি ম'রে
টান মুখে টান কে রক্ষা করে।
কুবলো তায় ভারি ও তার পাকে পড়ি'
যাবি কোটালের জলেতে ভেসে
আর দেশে যেতে পারবি না।
গুণটানা ওই গুণই ছেঁড়ে দমকা লেগে আছড়ে পড়ে
বেদম হাওয়ায় বাদাম যায় ছিঁড়ে।
তিন দিন বারুণী বারণ করিনি
বারুণী-যোগেতে স্নানে পূর্ণ মনের বাসনা।
কোমর বেঁধে এঁটে সেঁটে যেতে চাও ওই নদীর তটে
ঘোলা জল তলায় ঢেউ ওঠে।
শোন সমাচার ভেসেছে পাহাড় কত ভরা কিস্তি
হলো নাস্তি ডোবা মাল কেউ পেলে না।
হাউড়ের কথা ভুবন-ছাড়া যন্ত্র-পদ্মে যন্ত্র ধরা
মরা দেখে মরা-যোগ করা।
কথা এই ধার্য অতি আশ্চর্য
সুখ-নালেতে সুখের নিধি লুকানো কেউ জানলে না।

□

প্রেম সুখদ্বার কৃষ্ণ রসাকার রসনাতে তার কর আস্বাদন
সে যে যোগাযোগ-স্থলে মৃণাল-পথে চলে
সহজ কমলে সুধা বরিষণ।
সর্ব ঘটে বটে পটে পট্টস্থিতি
শক্তিতত্ত্ব গুণে আনন্দ মুরতি।
শৃঙ্গার-আকার ধরে সাধ্য কার
ঐ যে স্বরতি-সঞ্চার নবীন মদন।
আদ্য সুখসাধ্য বাধ্য কারুর নয়
ইন্দু বিন্দু গতি সদা বিরাজয়।
জীবে নাহি জানে সাধু সন্ত চেনে
রসপানে জানে তারা অমৃত-সেবন।
মন আত্মা বপু যত রিপুচয়
দেহেন্দ্রিয় সবাই তাহাতে মিশায়।
তাদের ব্রজ-প্রাপ্তি দেহ তৃপ্ত হয় জীবন।
কাম·প্রেম·রতি হবে এক ঠাঁই
সুখ-দুঃখ-আদি তথায় কিছু নাই
নির্মল সে পথে হাউড়ে চায় যেতে
ঐ শক্তি আত্মশক্তি হ'লে যায় দর্শন।

হাসন রাজা

লোকে বলে বলে রে ঘরবাড়ি ভালা না আমার
কি ঘর বান্ধিমু আমি শূন্যেরই মাঝার।
ভালা কইরা ঘর বান্দিয়া কয় দিন থাক্‌মু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে
জানত যদি হাছন রাজা বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান কোঠা করিয়া রঙ্গীন।

□

কানাই তুমি খেউড় খেলাও কেনে

রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই তুমি খেউড় খেলাও কেনে ?
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া কানাই আইলাম এই ভুবনে
হাছন রাজায় জিগ্‌গাস করে আইলাম কি কারণে।
কানাইয়ে যে করে রঙ্গ রাধিকা হইতেছে ঢঙ্গ
উড়িয়া যাইব জংবারপতঙ্গ খেলা হইব ভঙ্গ।
হাছন রাজায় জিংগাস করে কানাই কোন জন
ভাবনা চিন্তা করে দেখি কানাই যে হাছন।

□

মাটির পিঞ্জরার মাঝে বন্দী হইয়া রে
কান্দে হাছন রাজার মন-ময়নায় রে।
পিঞ্জারায় সামাইয়া ময়নায় ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে
এমন মজবুত পিঞ্জরা ময়নায় ভাঙ্গিতে না পারে।
উড়িয়া যাইব শুয়া পঙ্ক্ষী পড়িয়া রইব কায়া
কিসের দেশ আর আর কিসের খেশ
কিসের মায়া দয়া রে।
ময়না রে পালিতে আছি দুধকলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া।
হাছন রাজায় ডাকব তখন ময়না আয় রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়নায় আর কি ফিরিয়া চায়।

□

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি
সোনা মামী সোনা মামী গো—
আমারে করিলা রে বদনামী।
আমি হৈতে আল্লা রসুল আমি হৈতে কুল
পাগলা হাছন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমা হৈতে আসমান জমিন আমি হৈতে সব
আমি হৈতে ত্রিজগৎ আমি হৈতে রব।
আমি আউয়াল আমি আখের জাহের বাতিন
না বুঝিয়া দেশের লোকে ভাবে মোরে ভিন।
মরণ জীয়ন নাই রে আমার ভাবিয়া দেখ ভাই
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই।
পাগল হইয়া হাছন রাজা কিসেতে কি কয়
মরব মরব দেশের লোক মোর কথা যদি লয়।
আপনা চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়
হাছন রাজা আপন চিনিয়ে এই গান গায়।

অর্থ-সংকেত

দেহতত্ত্বের গানে পুরোপুরি অর্থ বিশ্লেষণ করা শোভন ও সংগত নয়, বোধহয় সর্বাংশে সম্ভবও নয়। তাই কয়েকটি গানের কিছু কিছু শব্দ ও অনুষঙ্গের ইঙ্গিত এখানে ধরিয়ে দেবার প্রয়াস থাকছে। সব গানের অর্থ-সংকেত জরুরী নয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি পাঠকরা এ-বইয়ের ভূমিকা অংশ ভাল ক'রে পড়ে নেন। তাতে অর্থ-সংকেত বোঝা সহজতর হবে। এখানে অর্থ-সংকেতে যে ব্যাখ্যা বা ভাষ্য থাকছে তা চরম নয়, একমাত্রও নয়, অন্যতম মাত্র। আচরণবাদী নানা গৌণধর্মের গুরুস্থানীয় ব্যক্তি এ সব শব্দের বা অনুষঙ্গের ভিন্নতর ভাষ্য দিয়ে থাকেন বা দিতে পারেন। পদকারদের নাম ও গানের সংখ্যা উল্লেখ ক'রে শব্দের অর্থ সংকেত থাকছে।

অনন্ত দাস ॥ গান সংখ্যা ১ ● কৃষ্ণ অনুরাগের বাগান—মানবদেহ। তিনজন মালি—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। চার রকমের ফুল—আলেফ-হে-মিম্-দাল। সরণি—রক্তবাহী শিরা। হংস-হংসিনী—পরমাত্মা-জীবাত্মা। এক বিন্দু জল—শুক্র। গান সংখ্যা ২ ● বাবা—পিতৃবস্তু (শুক্র)। গান সংখ্যা ৩ ● দুধ—সাধকের কর্ম।

অনামিকা ১ ॥ ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন—শ্বাস।

অনামিকা ২ ॥ বীজ—শুক্র। লাল জরদ ছিয়া ছফেদ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) গাছ—সন্তান।

আর্জান শাহ্ ॥ গান সংখ্যা ১ ● স্বরে অ—আত্মতত্ত্ব। বিলায়েত—মনের অন্তর্দেশ। তিনে নিত্য—গুরু। গান সংখ্যা ৩ ● রূপ—নারীদেহ বা সাধন সঙ্গিনী। গানসংখ্যা ৪ ● বর্তমানে ভজো—অনুমানে ঈশ্বর সাধনা দেহবাদীদের কাম্য নয়। তাঁদের সাধনা বস্তুবাদী। (বিস্তৃত ধারণার জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য) গান সংখ্যা ৫ ● কালা বোবা—বীর্য ও রজ।

কমলদ্বাল ॥ পুরুষ নারী দুই জাতি—দেহবাদীরা সাম্প্রদায়িক জাতিভেদে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে মানুষের দুটি মাত্র জাত—পুরুষ আর নারী। রুহু—আত্মা। আলিয়েম—নিরাকার। রব্বানা—আল্লা।

কুবির গোঁসাই ॥ গান সংখ্যা ১ ● মানুষের করণ—পূজা মন্ত্র শাস্ত্র ও সম্প্রদায়গত ধর্ম ছেড়ে মানুষভজন। তার নির্দেশ

একমাত্র গুরু বা মুর্শেদের কাছে লভ্য। গান সংখ্যা ২ ● হরিষষ্ঠী কাঁচাঘটে পূজিতা একরকম লৌকিক দেবী। মাকাল—জেলে সম্প্রদায়ের পূজ্য দেবতা, পাশাপাশি দুটি ঢিবির আকৃতি। গান সংখ্যা ৩ ● ধড় —মানবদেহ। ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই আছে ধড় বা দেহভাণ্ডে। গান সংখ্যা ৬ ● সাশুবির দরগা —নদীয়ার একটি লৌকিক দরগাতলা। হাজুদ —মানত। কলমা আল্লার নামে বিশ্বাস স্থাপন এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য এই প্রত্যয়। শরীয়তের অন্যতম কৃত্য। কালুল্যা—কোরাণ। আকবত—প্রথম থেকে শেষ, আগাগোড়া। হেল্যা—কারুর কাছ থেকে। নুর—পবিত্র জ্যোতি। গান সংখ্যা ৮ ● ফরাজি—মুসলমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ওজু—প্রক্ষালন। মানিক, মাদার, মল্লিক গাসে ও কাটাপীর—নদীয়ার বিভিন্ন পীরস্থানের নাম। হক—সত্য। ভেস্ত—বেহস্ত বা স্বর্গ। গান সংখ্যা ১০ ● চৌদ্দপোয়া নৌকা মানবশরীরের মাপ। গান সংখ্যা ১১ ● ছিদ্র নটা—মানবদেহের নবদ্বার অর্থাৎ ২ চোখ, ২ নাসিকা ছিদ্র, ২ কান, ১ মুখবিবর, ১ পায়ু, ১ উপস্থ। গান সংখ্যা ১৩ ● দোজক—নরক। পুলছেরত নদী—ইসলামী বিশ্বাস মতে আত্মার স্বর্গগমনের সূক্ষ্মপথ। গান সংখ্যা ১৪ ● নাটা—লাটাই। ভসকে—লাটাইয়ে সুতো আলগা হয়ে যাওয়া। জড়পটা—সুতোয় জট পাকিয়ে যাওয়া। মাতি—সুতোয় মাড় লাগানো। কাড়িয়ে তানা—তানা তৈরি করা। তানা অর্থে টানা, যার উল্টাকথা পোড়েন। সানা—টানা সুতো তাঁত যন্ত্রের যার ভেতর দিয়ে চালানো হয়। খেই—সুতোর প্রান্ত। বোয়া—টানা সুতোর সঙ্গে সংযুক্ত মোটা সুতো যা তাঁতের পা-কাঠির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

গগন হরকরা। মনের মানুষ—'আল্লাহ্ যিনি মস্তক-শীর্ষে ঈশ্বররূপে থাকেন এবং যিনি সহজ মানুষ হইয়া লীলা করেন তাহাদের মধ্যে একটু ভেদ, মূল মানুষ অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং এই অজান মানুষ আসলে একই কেবল রূপভেদ মাত্র।' 'আপাত দৃষ্টিতে মনের মানুষ—আল্লাহ্ বলে মনে হলেও রূপভেদে বোধ হয় পার্থক্য আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা ও বিশ্বদেবতার পার্থক্য' (দ্রষ্টব্য: লালন সাহিত্য ও দর্শন—খোন্দকার রিয়াজুল হক। ঢাকা ১৯৭৬ পৃষ্ঠা ২৩০)।

গোপালদাস।। গান সংখ্যা ১ ● হাতি—পরমাত্মা বা ঈশ্বরের রূপ। স্মরণীয় অন্ধের হস্তীদর্শনের রূপক। অসইলো—অশ্লীল। গান সংখ্যা ২ ● তিন কারিগর—ইড়া

পিঙ্গলা সুষুম্না। পঞ্চতত্ত্ব-ষড়রিপু-সপ্তধাতু-অষ্টসন্ধি-নয় দ্বার-দশইন্দ্রিয়— ভূমিকা দ্রষ্টব্য। গান সংখ্যা ৩ ● করোয়া —বৈরাগীদের ভিক্ষাপাত্র ও জলপাত্র।

গৌর গোঁসাই॥ গান সংখ্যা ২ ● নবদ্বীপ— পিতৃবস্তু। দেবগ্রাম— বীর্যক্ষয়। বিক্রমপুর— কাম। ঢাকা—স্ত্রীঅঙ্গ। রংপুর—কামনার বশীভূত হয়ে রঙ্গ। সদাবাজার—যেখানে শরীরের বিচার হয়। ছয় জন গাঁটকাটা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য। আখেরিগঞ্জ— মৃত্যু বা সাধনার ব্যর্থতা।

চাঁদ সুদীন॥ তেপায় গলি— দেহের শিরা। আটের কাছে যেমন তেমন একের কাছে ছয়— অষ্টসন্ধি বনাম কামের লড়াই।

গোঁসাই গোপাল॥ গান সংখ্যা ১ ● এক বাপ— পিতৃবস্তু। গান সংখ্যা ২ ● সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা— যে রতি ভক্তি খুব গাঢ় হয় না, কৃষ্ণদর্শনেই যা উৎপন্ন তাকে বলে সাধারণী রতি। মথুরায় কুব্জার ছিল সাধারণী রতি। সমঞ্জসা রতি জন্মায় গুণ ইত্যাদি শুনে, তাতে মিশে থাকে পত্নীত্বের অভিমান। দ্বারকায় কৃষ্ণ মহিষীদের ছিল সমঞ্জসা রতি। আর সমর্থা হ'লো শ্রেষ্ঠ রতি। যাতে আত্মসুখ থাকে না, কেবল কৃষ্ণসুখ থাকে। বৃন্দাবনে গোপীদের ছিল সমর্থা রতি। গান সংখ্যা ৩ ● পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ, অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ ও চারচন্দ্র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

জালালুদ্দিন॥ গান সংখ্যা ১ ● হু— নবী। হা—আদম। হে—আহাদ। রব্বানী— আল্লা (আল্লার ৯৯টি নামের একটি)। গান সংখ্যা ২ ● বয়তুল্লার শূন্যের পাথর— মানুষের কৃত। মারিফত— গোপন। পরোয়ারে—আল্লা। শরীয়ত— নিষ্ঠাবান মুসলমানদের আচরণীয় কলমা, রোজা, নামাজ, হজ্জ ও যাকাত। বে-লেহাজ— লজ্জাহীন। গান সংখ্যা ৭ ● রুহুজ্জামাল— আমিই আত্মা। এশক—প্রেম। ছারে-জাহান— সারা পৃথিবী। আবুল-বাশার— পিতার পুত্র অর্থাৎ শুক্রবিন্দু। শামছ—আমার যা আছে। রেজ দেওয়ানা—প্রত্যহই উন্মাদ। গান সংখ্যা ৮ ● দুইটি ভান্ডের পানি—রজবীর্য। পুরুষ নহে সবই মেয়ে— গোপীভাবাশ্রিত প্রেমভক্তি। একটি পুরুষ— কৃষ্ণ। ছুরত- সুরত বা সৌন্দর্য। গান সংখ্যা ১০ ● ষাইট হাজার গোপনের কথা—আল্লার সঙ্গে যখন নবীর মিলন হয় তখন ৯০ হাজার কথা জারি হয়েছিল। তার মধ্যে ৩০ হাজার প্রকাশ্য, ৬০ হাজার গোপন। এবাদত— সাধনা। আলী মর্তুজা— ফাতিমার স্বামী, নবীর জামাই অর্থাৎ হজরত আলী।

দীন শরৎ ॥ গান সংখ্যা ১ ● আলম্বন ও উদ্দীপন—ঈশ্বর সাধনার মূল অবলম্বন ও বাইরের প্রভাব। গান সংখ্যা ৪ ● সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র—দেহবাদী সাধকদের বিশ্বাস যে মানবদেহে অলক্ষ ভাবে সাড়ে চব্বিশটি চাঁদ আছে। গান সংখ্যা ৫ ● গরল-উন্মাদ-রোহিণী-বাণ—ভূমিকা দ্রষ্টব্য। গান সংখ্যা ৬ ● কামলা—শ্রমিক। গান সংখ্যা ৭ ● আট কুঠুরী নয় দরজা—দ্রষ্টব্য ভূমিকা। আঠারো মোকাম—মানব শরীরে পিতার উপাদান ৪টি (অস্থি, মজ্জা, বীর্য, স্নায়ু/শিরা), মাতার উপাদান ৪টি (ত্বক, মাংস, রক্ত, কেশ) এবং ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫ কর্মেন্দ্রিয় এই সব মিলিয়ে ১৮ মোকাম। গান সংখ্যা ৮ ● উল্টাদেশ—মাতৃগর্ভ।

দীনু ॥ গান সংখ্যা ১ ● চার চিজ—আগুন হাওয়া মাটি জল। চার খুঁটি—দুই হাত দুই পা। গান সংখ্যা ২ ● বল্—রক্ত।

দুদ্দু শাহ ॥ গান সংখ্যা ১ ● বাপের পুকুর এবং যাতে জন্ম তাতেই মৃত্যু—স্ত্রী যোনি। গান সংখ্যা ৩ ● লতাসাধনা—দেহকেন্দ্রিক সাধনা। গান সংখ্যা ৪ ● দিদার—দর্শন। বৈদিক—বেদমূলক ধর্ম সাধনা দেহবাদীদের মতে ভ্রান্ত অতএব পরিত্যাজ্য। গান সংখ্যা ৫ ● জীয়ন্তে মরা—চিত্তের স্থিরতা। গান সংখ্যা ২১ ● উল্—সন্ধান।

পদ্মলোচন ॥ গান সংখ্যা ২ ● আট আট চৌষট্টি কুঠুরি—ফকির মতে 'লা-মাকান' হ'লো আত্মার বসতি। বারুদ-কুঠুরি ঘর—কামনার স্থান। অহিরেব রেখা—প্রেমের গতি অহিরেব বা সাপের মত। গান সংখ্যা ৩ ● চাম-চটা এগারো জনা—নবীর ১৩ জন বিবির মধ্যে ১১ জন বন্ধ্যা। ফলহীন সাধনার প্রতীক। গান সংখ্যা ৪ ● পিতৃদ্রোহী কর্ম—কামনার দাস হয়ে যাওয়া। চৌরাশী ভ্রমণ—জীব পাপ ক'রে চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে এমত বিশ্বাস। ৯ লক্ষ বার জলজ যোনি, ২০ লক্ষ বার স্থাবর যোনি, ১১ লক্ষ বার কৃমি যোনি, ১০ লক্ষ বার পক্ষী যোনি, ৩০ লক্ষ বার পশু যোনি এবং ৪ লক্ষ বার মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করে।

পাগলা কানাই ॥ গান সংখ্যা ১ ● চারমুড়ায় চারজন—আগুন হাওয়া মাটি জল। গান সংখ্যা ২ ● চার রঙের পানি—সিয়া সফেদ জরদ লাল, রজস্রাবের রং। গান সংখ্যা ৩ ● গরল ফুল—রজস্রাবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সম্মিলন। বারো পুষ্প বারো মাসে—নারীর রজস্রাব।

পাঞ্জ শাহ্ ।। গান সংখ্যা ১ ● ইন্দ্রাবারি—মেঘের জল। গান সংখ্যা ৩ ● মনুরায়—মনের মানুষ।

বদিওজ্জমান ।। কাদের গনি—আল্লার ৯৯টি নামের একটি।

মদন শাহ্ ।। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'—দেহ সংগম। 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম'—মাতৃধারা থেকে কন্যা (ঝি) জন্মায়। আবার সে যখন মা হয়। 'ঘর আছে দুয়ার নাই ·· সন্ধ্যাবাতি'—মাতৃগর্ভ ও সন্তান। ছমাসে হয় জীবের স্থিতি—(এখানে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে, ৬ মাস আসলে হবে ৩ মাস) অর্থাৎ তিন মাসে পিতার মস্তকে শুক্রের তরলীকরণ হ'তে লাগে। তিনের আরেক তাৎপর্য হলো জীবনের গঠনে ত্রিস্তর পেরোতে হয়—প্রথমে পিতার মস্তকে তারপরে মাতার গর্ভে এবং সবশেষে ভূমিষ্ঠ হয়ে। 'ন মাসে হয় গর্ভবতী'—৩+৯ অর্থাৎ বারো বছর বয়সে সাধারণত নারীর রজোদর্শন হয়। 'এগারো মাসে তিনটি সন্তান'—১০ মাস ১০ দিন মানে ১১ মাস। তিনটি সন্তান ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ব্রহ্মা থেকেই শুরু হয়েছে ফকিরি তত্ত্ব। 'মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে'—দেশলাই কাঠির ঘর্ষণ হ'লে যেমন আগুন জ্বলে কিন্তু বারুদ নষ্ট হয়ে যায় তেমনই দেহ সংগমে সন্তান জন্মায় কিন্তু বীর্যক্ষয় হয়ে যায়।

মিয়াজান ফকির ।। ফুল ফুটে মাসে মাসে—নারীর রজস্রাব। ছয় মাস অন্তে পুরুষের ফুল—মারফতী ফকিরদের বিশ্বাস যে ছ মাস অন্তর পুরুষেরও রজোপ্রবৃত্তি ঘটে।

যাদুবিন্দু গোঁসাই ।। গান সংখ্যা ১ ● কুল আলম—আল্লা। কুদরত—কর্ম কুশলতা। গান সংখ্যা ৪ ● রূপ-নগর—নারীদেহ। গান সংখ্যা ৮ ● কুবিরচাঁদে ভাষে হুদার গদীতে বসে—যাদুবিন্দুর গুরুর নাম কুবিরচাঁদ। গুরুপাট নদীয়া জেলার বৃত্তিহুদা (সংক্ষেপে হুদা) গ্রাম। গান সংখ্যা ১০ ● গুপ্তিপাড়া—গোপ্য কায়া-সাধনা। শান্তিপুর—সাধনার শেষে ক্ষমতা প্রাপ্তি। নদে—শরীরের শিরা। তেঘাড়ি—ইড়া পিঙ্গল সুষুম্না। স্বরূপগঞ্জ—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

রশীদ ।। গান সংখ্যা ১ ● নিগুম ঘর—অগম্য স্থান। 'সাত পাঁচে' এবং 'পাঁচ কুঠরিতে সাত মুহুরি'—সাত তারা ও পাঁচ বাণ। কথিত আছে যে সিতারা থেকে ময়ূরের উৎপত্তি তার থেকে নূর বা জ্যোতির সৃষ্টি, নূর থেকে ডিম্ব, ডিম্ব থেকে হু-হে-হা অর্থাৎ নবী-আহাদ-আদম। তিন থানা—ত্রিবেণী। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার মিলন স্থানই ত্রিবেণী। ত্রিবেণীর তিনধারা একধারা থেকে সৃষ্ট আবার এক ধারাতেই সম্পূর্ণ। 'পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘর'—সাড়ে চব্বিশচন্দ্র যুক্ত দেহ। 'এক মানুষের তিনটে বরণ'—হে-হু-হা—অর্থাৎ আহাদ

নবী আদম, মতান্তরে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ অদ্বৈত। গান সংখ্যা ২ ● জায়নামাজ—নামাজ পড়বার আসন। সেজদা—নতি বা প্রণাম।

লালন শাহ্‌। গান সংখ্যা ১ ● আলেক— অলক্ষ। দ্বিদল পদ্ম— আজ্ঞাচক্র। গান সংখ্যা ২ ● মনসুর হাল্লাজ—আমি আল্লা এই দাবীকারী ফকির। শরা—শরীয়ত। আমি হাঁল্যা—আমি আছি। গান সংখ্যা ২১ ● চৈতে নিতে অদ্বে পাগল—চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত। গান সংখ্যা ২৩ ● আলাভোলা—আলোয়ার আলো। ফেঁওফেঁপি—নিম্নস্তরের লোক। ফেকসা—সারহীন। ভাকাভুকো—মিথ্যা কথা ব'লে প্রতারণা। চটামারা—অত্যন্ত চঞ্চল। গান সংখ্যা ২৬ ● নবুওত—হজরত মহম্মদ কর্তৃক নবীকে দেওয়া আল্লার ছাপ না শিল। হেদায়েত—অন্তর্দেশ। শরাকে সরপোষ—শরীয়ত হ'লো মারফত বা গোপন তত্ত্বের সরপোষ বা আবরণ। অর্থাৎ সরপোষ বা শরীয়ত আবরণ এবং মারফত হলো মূলবস্তু। তাই আবরণ সরালে মূলবস্তুই থেকে যায়। কিন্তু মারফত প্রকাশযোগ্য নয়। তাই বলা হয়—

চোরে যেমন চুরি করে
বলে ফেললে দোষে পড়ে
মারফাত সেই প্রকারে
চোরামালের তেজারাত।

গান সংখ্যা ২৭ ● বেলীরে জনা—নির্লজ্জ লোক। আয়েৎ—আরবি হরফ। নিয়াত—প্রার্থনা বা অঙ্গীকার। বরজখ—ধ্যান। অন্যমতে মৃত্যুর পরে স্বর্গ বা নরকে যাবার আগে আত্মার থাকবার স্থান। গোমেতো—গম্ভীর। গান সংখ্যা ৩০ ● হামেশ—সর্বদা। ফারা—আওয়াজ। ফোকতারা—মাল-মশলা শেষ হওয়া অবস্থা। গান সংখ্যা ৩৩ ● আরশিনগর—ভ্রূ মধ্যের স্থান। পড়শী—আলেকসাঁই (আলাক এই আরবি শব্দের অর্থ বীর্য অর্থাৎ আলোকসাঁই মানে বীর্য-প্রভু। গান সংখ্যা ৪০ ● বিনা মেঘে বারি—শুক্র। গান সংখ্যা ৪৫ ● সাতাশ নক্ষত্র—২৭ দিন পর রজো-প্রবৃত্তির রূপক। গান সংখ্যা ৪৮ ● আবাল গুড়ি—বৈরাগ্যের সরঞ্জাম।

হাউড়ে গোঁসাই।। গান সংখ্যা ১ ● শ্রীরূপ নদী—নারী দেহ। জন্ম ধারা—রজোস্রোত। তিন দিন বারুণী—রজ-স্রাবের তিন দিন।

হাসন রাজা।। গান সংখ্যা ২ ● খেউরে খেলা—খেলা খেলাও। গান সংখ্যা ৩ ● খেস—খায়েস বা সখ।